আলোর মিছিল

ষষ্ঠ খণ্ড

ডঃ আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন কাহিনী

আলোর মিছিল

ষষ্ঠ খণ্ড

মূল

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদ

মাওলানা ইবরাহীম মোমেন শাহী

মুহাদ্দিস: বাবুস সালাম মাদরাসা

বিমান বন্দর, ঢাকা

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে আল্লাহ! আমি নির্ভরযোগ্য সুনির্বাচিত
তাবেঈদেরকে এমন প্রাণ উজার করে ভালোবাসি,
যার চেয়ে অধিক ভালো আমি প্রিয় রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের
ছাড়া আর কাউকেই বাসি না।
সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে
মহাত্রাসের দুর্দিনে 'এই দল' (তাবেঈগণ) অথবা
'ঐ দল' [সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)] -এর যে কোন
একজনের পাশে একটুখানি স্থান দিয়ো।
তুমি তো জানো! আমি শুধু তোমারই জন্য
তাদেরকে ভালোবাসি! ইয়া আকরামাল আকরামীন।

—আবদুর রহমান

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন কাহিনী "আলোর মিছিল" এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হয়েছে অনেক দিন আগেই। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডের কম্পোজ হয়ে প্রথম প্রুফ ও দ্বিতীয় প্রুফের কাজ শেষ হয়েছে তাও প্রায় বছর হতে চললো। কিন্তু ফাইনাল প্রুফ যেহেতু আমার মতো অকর্মন্যকে দেখতে হয়। তাই অনেক বেশী দেরী হয়ে গেলো। আগ্রহী পাঠক ও আমাদের শুভানুধ্যায়ীগণ যেভাবে এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তাকীদ দিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন। সেটা এ যুগে একান্তই বিরল।

আলহামদুলিল্লাহ! এখন খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ট খণ্ড প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আর এ খণ্ডগুলোর প্রকাশনায় অনাকাংখিত বিলম্বের জন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অনুবাদ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা, তাহলো এ খণ্ডগুলো নবীনদের হাতে অনূদিত হলেও সম্পাদনা যেহেতু মজবুত ভাবে করা হয়েছে। তাই এ খণ্ডগুলো পূর্বের খণ্ডগুলোর মতো সুখপাঠ্য হবে ইনশা আল্লাহ্।

এ ছাড়া "আলোর কাফেলা" যা এ লেখকের সাহাবায়ে কেরামের জীবন সম্পর্কিত গ্রন্থ। যার ১ম খণ্ড আমরা পূর্বেই প্রকাশ করেছি, অবশিষ্ট খণ্ডগুলো ও ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

মূল গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে দুটি কথা

মূল গ্রন্থকার বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক মরহুম ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহঃ)। মূল গ্রন্থের নাম 'সুওয়ারুম্ মিন হায়াতিত্ তাবেঈন'। লেখক তাঁর কালজয়ী এই গ্রন্থে শুধু কেবল একান্ত সত্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোকেই স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আরব বিশ্বে ব্যাপকহারে সমাদৃত ও বহুল পঠিত এই রচনা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটি সব ধরনের বাহুল্য, ভুল ও দুর্বল তথ্য মুক্ত একটি অমর ও অনবদ্য গ্রন্থ।

এতদসত্ত্বেও উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন এ গ্রন্থের হৃদয় জুড়ানো ভাষা ও আবেগ জাগানো এক অনন্য রচনাশৈলী পাঠককে আলোড়িত করে তীব্রভাবে। পাঠক কখনো হন মুগ্ধ, কখনো আবার ভীষণ বেদনাহত। কখনো তার হৃদয় কূলে আছড়ে পড়ে অনুশোচনার ঢেউ। কখনো ভেসে যায় তার দু'চোখের কূল। লেখকের অপূর্ব বর্ণনাভংগি পাঠককে বইয়ের পাতা থেকে একটানে তুলে নিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতে, সোনালী যুগের এক সোনালী সকালের পবিত্র আসরে। এভাবেই এ গ্রন্থের জীবনীগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন স্বচক্ষে।

এই গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডে যেসব মহামনীষীর জীবন কথা আলোচিত হয়েছে, ইসলামে তাঁদেরকে আখ্যায়িত করা হয় 'তাবেঈন' বলে। তাঁদের নামের শেষে বলা হয় 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি'। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রুহের উপর।

মূলতঃ এ পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণকর ও উত্তম আদর্শের যিনি মূর্ত প্রতীক, যিনি সততা, সাধুতা, সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকামিতাসহ যাবতীয় উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি মনুষ্যত্বের নির্মাতা, তিনি হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যুগস্রষ্টা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এই মহামানব মাত্র তেইশ বছরের নবী জীবনে আসমানী অহীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন এমন একদল মানুষ, যারা আজ পর্যন্ত এবং অনাগত ভবিষ্যতের মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাদুতুল্য শিক্ষা আর পরশপাথরতুল্য সান্নিধ্য যাদেরকে এনে দিয়েছিলো 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি'র বিরল সম্মান আর তাঁদের যুগকে দিয়েছিলো 'সোনালী যুগ'-এর আখ্যা। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ শিক্ষা ও সান্নিধ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত 'তাঁরা' এবং তাঁদের 'যুগ' ছিলো 'বর্বর' বলে অভিযুক্ত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানদীপ্ত এইসব সহচর, যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা ও সান্নিধ্যের ঈমানী সুবাস নিয়েই যাদের মৃত্যু হয়েছিলো, তাঁদেরকেই বলা হয় সাহাবী। তাঁদের নামের শেষে বলতে হয় রাযিয়াল্লাহু আনহু বা আনহা'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর শিক্ষায় জীবনগড়ার একমাত্র মাধ্যম ছিলেন তাঁরই হাতে গড়া সাহাবী জামা'আত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ার ফলে তাবেঈগণ একমাত্র মাধ্যম সেই সাহাবী জামাআতকেই আঁকড়ে ধরেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় আলোকিত করে তোলেন নিজেদের জীবন ও মনন। কোন তাবেঈ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পাননি। তাঁরা পেয়েছিলেন 'আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' -এর সরাসির শিক্ষা ও সাহচর্য। এজন্যই তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হতে পারেননি, পেরেছিলেন তাঁর সহচরদের সহচর হতে। এভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেলেও সাহাবায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় তাবেঈদের মাঝেও নিখুঁতভাবে গড়ে ওঠে সমস্ত ঈমাণী গুণ ও বৈশিষ্ট্য। ফলে তাঁরাও দিনের আলো আর রাতের আঁধারে সমানভাবে আল্লাহকে ভয় করতেন দুর্দিনে আর সুদিনে সমানভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। আমীর ও ফকীর, শাসক ও শাসিত সকলের সামনেই তাঁরা নির্ভীকভাবে হকের উচ্চারণ করতেন। এসব ঈমানী বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীগণের পরে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন তাবেঈগণের। যে কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তিনি বলেছেন–

"আমার যুগটাই সর্বশ্রেষ্ঠ তারপর পরবর্তী যুগ তারপর তারও পরের যুগ..."

আমার ধারণা বর্তমান লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, নীচতা-হীনতা ও বর্বরতার এই ঘন অমানিশায় আচ্ছন্ন পৃথিবীতে 'আলোর মিছিল' আশার আলো ফুটাতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ!

বইটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি। তারপরও কোন অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের জানানোর অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দার জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

তারিখ ঃ ২৯শে রজব ১৪২৭ হিজরী

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজিমপুর, ঢাকা

অনুবাদকের আরয

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

আল্লাহ্পাক মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণের জন্য ইসলাম ধর্ম দিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে দ্বীন শিখে সে অনুপাতে আমল করে আল্লাহপাকের সন্তোষভাজন হয়েছেন।

তৎপরবর্তি স্তরের যে সকল সৌভাগ্যবান মানুষ হযরত সাহাবায়ে কেরামের (রাযি.) সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন, তাদেরকে শরীঅতের পরিভাষায় 'তাবেঈন' বলা হয়। তাদের গুনাবলী ও আখলাক অনেকটা হযরত সাহাবায়ে কেরামের মতোই ছিলো। এজন্য হযরত সাহাবায়ে কেরামের জীবন-চরিত পাঠ করলে যেমন ঈমান মযবুত হয়, আমলের আগ্রহ বাড়ে, তদ্রূপ তাবেঈদের জীবনকাহিনী পাঠেও ঈমান-আমলের উন্নতি হয়। সম্ভবত এ দিকটি লক্ষ্য করেই মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্ত্বাধিকারী যুগ সচেতন বিচক্ষণ আলেম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ছাহেব "আলোর মিছিল" শীর্ষক তাবেঈদের ঈমানদ্বীপ্ত জীবনকাহিনী সিরিজ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

এ সিরিজের পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড অনুবাদের দায়িত্ব আমি অধমকে দেয়া হয়। বই প্রকাশের এ মূহুর্তটি আমার জন্য একদিকে যেমন আনন্দের, অপর দিকে খুব ভীতির ও বটে। কারণ সেটাই ছিলো আমার জীবনের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ।

আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ অনুবাদকে পাঠক প্রিয়তা দান করেন। আর যারা আমাকে দু'আ দিয়েছেন, হিম্মত জুগিয়েছেন তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করেন।

বর্তমান গ্রন্থ এ সিরিজের ষষ্ঠ খণ্ড। আমি আমার সাধ্যমত এটিকে সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। এতদ সত্ত্বেও যদি কোথায়ও কোন অসংগতি দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলে আমাকে জানালে শুধরে নিবো।

আল্লাহ পাক এই নগন্য খেদমত কবুল করে এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সবাইকে দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত করুন। আমীন!

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম

মধুপুর, টাঙ্গাইল

সূচীপত্র

নাজাশী আসহামা ইবনে আবজার (রহ.)

নাজাশীর ইন্তেকালের পর তার কবর থেকে
আলো বিচ্ছুরিত হওয়া সম্পর্কে সর্বদা
আমরা পরস্পরে আলোচনা করতাম।

—উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.)

নাজাশী আসহামা ইবনে আবজার (রহ.)

আমরা এখন যে মহান ব্যক্তির কথা আলোচনা করব তিনি একজন তাবেয়ী। তাবেয়ীদের আলোচনা করলে তাকেও উল্লেখ করতে হয়...

তিনি একজন সাহাবীও বটে। সাহাবীদের গণনা করলে তার নামও বাদ দেয়া যায় না...

তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পত্র লিখতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার কাছে পত্র পাঠাতেন।

তিনি পরম বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ব্যতীত আর কারও জন্য গায়েবানা জানাযা পড়েননি।

তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন আসহামা ইবনে আবজার। বিশ্ববাসীর কাছে যিনি "নাজাশী" উপাধীতে সমধিক পরিচিত।

তাই এসো আমরা এই অনন্য ব্যক্তির জীবনালোচনায় কিছুক্ষণ কাটাই।

*　　*　　*

আসহামার পিতা ছিলেন হাবশার অধিপতি। আসহামা ব্যতীত আর কোন সন্তান তার ছিল না।

তাই হাবশার কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পরস্পরে বলতে লাগল ঃ এই আসহামা ব্যতীত আমাদের বাদশাহর তো আর কোন সন্তান নেই ...

আর সে তার পিতার জীবদ্দশায় তার পিতার বাহুকে শক্তিশালী করবে। এবং তার মৃত্যুর পর সেই হবে রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী। আর আমাদেরকে ঠেলে দিবে এমন মর্মন্তুদ পরিণতির দিকে যা আনন্দদায়ক নয়।

অতএব আমরা যদি সম্রাটকে হত্যা করি এবং তার ভাইকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি তাহলে তা খুবই ভাল হয়। কারণ তার রয়েছে বারজন পুত্র

যারা তার সহযোগীতা করবে, তার শক্তি বৃদ্ধি করবে। এবং তার মৃত্যুর পর তারাই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে।

এভাবেই শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রনা দিয়ে আসছিল। এবং তাদের অন্তরে ভয় ও শংকা সঞ্চারিত করছিল। তাই এক সময় তারা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল এবং তাদের সম্রাটকে হত্যা করে ফেলল এবং তার ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে তার হাতে আনুগত্যের শপথ নিল।

* * *

আসহামার পিতা নিহত। বালক আসহামা এখন এতীম, তাই তার লালন-পালন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য এগিয়ে এলেন তার চাচা। যিনি হাবশার বর্তমান সম্রাট।

আসহামা তার চাচার তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে লাগল। এবং তার জীবন কলি থেকে ফুটে উঠছিল প্রখর মেধা, বিচক্ষণতা, উজ্জ্বল বর্ণনা শক্তি এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব।

যার ফলে বালক আসহামা আপন চাচার হৃদয়কে ভরে দিল বিমুগ্ধতায় এবং তার অনন্য বৈশিষ্টে এবং নিজ সন্তানদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বে।

কিন্তু শয়তান বসে নেই। আবার সে হাবশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্ররোচনা দিতে লাগল। শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়ে ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠল তারা। এবং একে অপরকে বলতে লাগল ঃ

আল্লাহ্র কসম! আমাদের তো আশংকা হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত রাজত্ব এই যুবকের হাতেই অর্পিত হবে এবং সেই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হবে। আর যদি এটা চুড়ান্তই হয়ে যায় তাহলে তো সে আমাদের থেকে মর্মান্তিক প্রতিশোধ নিবে এবং তার পিতার হত্যার দায়ে আমাদের সবাইকে হত্যা করবে।

তাই তারা বাদশার কাছে গিয়ে বলল ঃ

হে মহামান্য সম্রাট! আসহামাকে হত্যা করা কিংবা তাকে এ রাজ্য থেকে বের করে দেয়া ছাড়া তো আমরা কোন শান্তি পাচ্ছি না। এবং

আমাদের অন্তর শান্ত হচ্ছে না। সে তো এখন যুবক হয়ে ওঠেছে। আর আমরা আশংকা করছি যে তার পিতার হত্যার দায়ে সে আমাদেরকে ও হত্যা করবে।

তাদের কথা শুনে বাদশাহ একেবারে রেগে গেলেন। তিনি বললেন ঃ ছি... তোমরা কতো নিকৃষ্ট!!

কাল তোমরা তার পিতাকে হত্যা করলে আর আজ তাকেও হত্যা করার জন্য আমায় প্ররোচনা দিচ্ছ ...

আল্লাহ্‌র কসম! কিছুতেই আমি তা করতে পারব না...

তখন তারা বলল ঃ তাহলে আমরাই তাকে নিয়ে যাব এবং আমাদের এ রাজ্যের বাইরে বের করে দিব।

এবার বাদশাহ কিছু বলতে পারলেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক রকম বাধ্য হয়েই তিনি সম্মত হলেন।

* * *

আসহামাকে রাজ্যের বাইরে রেখে আসার পর এক দুই দিনও অতিবাহিত হয়নি এর মধ্যে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল যার কল্পনাও কেউ করতে পারেনি।

ঘনকৃষ্ণ মেঘে সমগ্র আকাশ ছেয়ে গেল...

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বজ্রপাত হতে লাগল...

একটি বজ্র এসে পড়ল তার চাচার উপর। যিনি আপন ভাতিজার বিচ্ছেদে বেশী ব্যাথীত ছিলেন। বজ্রপাতের ফলে সাথে সাথেই তিনি নিহত হলেন...

বাদশাহ নিহত হয়েছেন হাবশার সিংহাসন এখন শূণ্য। তাই বাহশার নেতৃস্থানীয় লোকজন তার ছেলেদের কোন একজনের উপর রাজ্যের ভার অর্পন করার জন্য তাদের কাছে গেল। কিন্তু তাদের কারো মধ্যে তারা কোন কল্যাণই দেখতে পেল না।

ফলে তারা অত্যন্ত দুঃখিত হল। এবং সমস্ত ব্যাপারটাই তাদের কাছে একেবারে সংকীর্ণ হয়ে গেল।

আরেকটি বিষয় তাদের দুশ্চিন্তা ও দুঃখ বেদনা বাড়িয়ে দিল। তা হল হাবশার প্রতিবেশী কোন কোন রাজা এই সুযোগকে গণীমত মনে করল এবং হাবশায় আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষায় রইল...

তাই তারা আবার একে অপরকে বলতে লাগল ঃ

আল্লাহ্র কমস! কাল যে তরুণকে রাজ্যের বাইরে বের করে দিয়েছ সে ব্যতীত কেউ তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না এবং তোমাদের রাজত্ব কেউ হেফাজত করতে পারবে না।

অতএব হাবশায় তোমাদের কোনরূপ প্রয়োজন আছে বলে যদি তোমরা মনে কর। তাহলে তাকে ফিরিয়ে আন। এবং তার হাতেই রাজ্যের ভার অর্পণ কর...

ফলে আবার তারা আসহামার খোঁজে বের হল এবং তাকে আপন রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

এবং তার মাথায় শাহী মুকুট পরিয়ে দিল। এবং তার হাতেই আনুগত্যের শপথ নিয়ে তাকে "নাজাশী" উপাধীতে ডাকতে শুরু করল।

এবার তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন...

অশান্তি ও বিশৃংখলা থেকে আল্লাহ্র বান্দাদের শান্তি দিলেন...

ন্যায় ও কল্যাণে ভরে দিলেন সমগ্র হাবশাকে। অথচ ইতিপূর্বে এই হাবশাই ছিল জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায় অবিচারের আধার রাজ্য।

* * *

নাজাশী এখনও স্থীরভাবে সিংহাসনে বসেননি। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা হেদায়েত ও সত্যদ্বীনসহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পাঠালেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকলেন। আর মানুষ একের পর এক তার ডাকে সাড়া দিতে লাগল।

তাই মক্কার কোরাইশরা তাদের উপর জুলুম অত্যাচার শুরু করল এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে ক্ষতি করতে লাগল।

তাই প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও মক্কা যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং মুশরিকরা তাদের উপর এমন অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করল যে অটল অবিচল পাহাড়ও তাতে প্রকম্পিত না হয়ে পারে না।

তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ

হাবশায় একজন ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ আছেন। তার কাছে কেউ জুলুমের শিকার হয় না। সুতরাং তোমরা তার রাজ্যেই হিজরত করে চলে যাও এবং তার কাছেই আশ্রয় নাও। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা না করেন এবং এই সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের কোন পথ বের না করে দেন ততক্ষন পর্যন্ত তোমরা তার কাছেই থাক।

* * *

নবীজীর পরামর্শে মুহাজিরদের প্রথম দলটি হাবশার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। নারী-পুরুষ মিলে কাফেলার যাত্রী সংখ্যা ছিল আশি জন।

ফলে ইসলাম গ্রহণের পর এই প্রথমবারের মত তারা শান্তি ও নিরপত্তার স্বাদ উপভোগ করল

কোন রূপ বাধা বিপত্তি ছাড়াই তাকওয়া ও ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করল এবং কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত ঈমানের মিষ্টতা উপভোগ করল।

আশি জন মুসলমানের একটি কাফেলা গোপনে হাবশায় হিজরত করেছে এবং তারা স্থায়ীভাবে সেখানে শান্তি ও নিরাপদ জীবন যাপন করছে এ সংবাদ জানার সাথে সাথেই কোরাইশরা সেখানেই তাদেরকে হত্যা করা কিংবা তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য পরস্পরে পরামর্শ করতে লাগল।

* * *

পরামর্শ অনুযায়ী কোরাইশরা নাজাশীর কাছে দুজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সর্দারকে পাঠাল।

তাদের একজন ছিল আমর ইবনুল আস। অপরজন আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী রবীআ।

হিজায অঞ্চলের যে সকল বস্তু নাজাশী এবং তার মন্ত্রিগণ পছন্দ করতেন প্রচুর পরিমাণে সেগুলো তাদের জন্য নিয়ে গেল।

হাবশায় পৌঁছে বাদশাহ নাজাশীর সাথে সাক্ষাত না করে প্রথমেই তার মন্ত্রিদের সাথে সাক্ষাত করল।

এবং প্রত্যেক মন্ত্রির কাছেই উপঢৌকন পেশ করে বলল ঃ আপনাদের রাজ্যে আমাদের কিছু নির্বোধ নারী পুরুষ আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং আপন সম্প্রদায়ের ঐক্য ছিন্ন বিছিন্ন করে দিয়েছে।

তাই আমরা যখন তাদের ব্যাপারে বাদশাহর সাথে আলোচনা করব তখন আপনারা সকলেই বাদশাহকে এই পরামর্শ দিবেন যে, তিনি যেন তাদের ধর্ম সম্পর্কে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তাদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করেন। কারণ তাদের সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিরাই তাদের সম্পর্কে ভাল জানে...

এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে খবর রাখে...

*　　*　　*

আমর ইবনুল আস এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী বরীআ বাদশাহ নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হল এবং নাজাশীকে সিজদা করল যেমন তার প্রজারা তাকে সিজদা করে।

তাই নাজাশী তাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিলেন। কেননা পূর্ব থেকে আমর ইবনুল আসের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল।

এরপর তারা দু'জন কোরাইশ শীর্ষনেতা আবু সফিয়ান এবং অন্যান্য সর্দারদের অভিবাদন সহ বাদশাহর সামনে উপঢৌকন পেশ করল।

তাদের উপঢৌকনগুলো বাদশাহ খুবই পছন্দ করলেন এবং মুগ্ধ হলেন।

তারপর বাদশাহ্র সাথে তারা আলোচনা শুরু করল। বলল ঃ হে বাদশাহ! আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু নির্বোধ নিকৃষ্ট লোক আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। আপনার দ্বীনও তারা গ্রহণ করেনি।

তারা এমন এক নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে যার সম্পর্কে আমাদের কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। অনুগ্রহ পূর্বক তাদেরকে আমাদের সর্দারদের কাছে ফিরিয়ে দিন। কেননা তারা যে নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছে এবং আমাদের সমাজে যে ফিৎনা সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে আমাদের সর্দারগণই সম্যক অবগত।

নাজাশী তখন তার মন্ত্রিদের দিকে তাকালেন। সেনাপতিগণ সমস্বরে বলতে লাগল ঃ

হে সম্মানিত বাদশাহ! তারা সত্যই বলেছে। কেননা আমরা তাদের নব আবিষ্কৃত ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না...

তাদের সম্প্রদায়ই তাদের সম্পর্কে এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে ভাল জানে...

নাজাশী তখন দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ

আল্লাহ্‌র কসম! তাদের কথা না শুনে এবং তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে না জেনে একজনকেও আমি তাদের হাতে সমর্পণ করতে পারব না।

যদি তারা ভ্রান্তির মধ্যে থাকে তাহলে তাদের কওমের হাতে সোর্পদ করব...

আর যদি তারা সত্য ও কল্যাণের উপর থাকে তাহলে যতদিন তারা আমার রাজ্যে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি তাদের হিফাজত করব এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করব...

এরপর আরও বললেন ঃ

আল্লাহ্‌র কসম! আমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না...

তিনি আমাকে আমার পিতৃভূমিতে ফিরিয়ে এনেছেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন...

এবং আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের থেকে আমাকে হিফাজত করেছেন।

* * *

নাজাশী মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে তাদের গোত্রের সর্দারদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য ডেকে পাঠালেন। যার ফলে তারা শংকিত হয়ে পড়লেন এবং পরস্পরে বলতে লাগলেন ঃ

বাদশাহ যদি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তাহলে তোমরা কি জবাব দিবে ?

তখন তাদের শীর্ষব্যক্তি বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তার কিতাবে যা বলেছেন আমরা তাই বলব এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে বাণী নিয়ে এসেছেন আমরা তারই ঘোষনা দিব...

এরপর তারা বাদশাহ্র কাছে গেলেন। বাদশাহ্র কাছে তখন আমর ইবনুল আস এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী রবীআ উপস্থিত ছিল।

আর বাদশাহ্র ডানে বামে ছিল তার মন্ত্রিগণ। তাদের মাথায় শোভা পাচ্ছিল এক বিশেষ ধরনের টুপি...

তারা তাদের সামনে মেলে রেখেছিল তাদের নথিপত্র...

মুহাজিরগণ ইসলামী আদব কায়দায় নাজাশীকে অভিবাদন করলেন এবং মজলিসের শেষ প্রান্তে বসে পড়লেন।

তখন আমর ইবনুল আস তাদের দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ঃ

কি হল তোমরা বাদশাহ্কে সিজদা করছনা কেন?

মুহাজিরগণ তখন বললেন ঃ আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সিজদা করি না।

নাজাশী তাদের কথায় বিমুগ্ধ হয়ে মাথা দুলালেন এবং তাদের দিকে মমতার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে বললেন ঃ

এই যে তোমরা নতুন একটি ধর্ম আবিষ্কার করলে যার ফলে তোমরা তোমাদের গোত্রীয় ধর্ম ত্যাগ করলে আর আমার ধর্মও গ্রহণ করলে না এই ধর্মের স্বরূপ কি? কি তার করণীয় ও বর্জনীয় ?

তখন হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাযি.) অনুমতি চেয়ে বলতে লাগলেন ঃ

হে মহামান্য সম্রাট! আমরা নতুন কোন ধর্ম উদ্ভাবন করিনি। আমাদের কাছে তো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আপন পালনকর্তার পক্ষ থেকে হেদায়েত ও সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন।

আমরা তো ছিলাম অজ্ঞ মুর্খ এক জাতি। আমরা মূর্তিপুজা করতাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। মৃত প্রাণী ভক্ষণ করতাম। যাবতীয় অশ্লীলতায় আমরা ডুবেছিলাম। প্রতিবেশীর সাথে সর্বদা অসদাচরন করা এবং দুর্বলদের উপর জুলুম করা ছিল আমাদের শক্তিশালীদের নিত্তমৈত্তিক ব্যাপার...

হে মহামান্য সম্রাট! এ অবস্থার দিয়েই চলছিল আমাদের দিন। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন। যার বংশপরম্পরা সম্পর্কে আমাদের জানা আছে এবং যার সততা সুচিতা ও পবিত্রতার ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকলেন তাঁর ইবাদত করার এবং একত্ববাদের নির্দেশ দিলেন।

আমাদেরকে নামায কায়েম করতে যাকাত প্রদান করতে এবং রমযানের রোযা রাখতে উৎসাহ দিলেন। এবং যে পাথর ও মূর্তিকে আমরা পূজা করতাম সম্পূর্ণরূপে তা পরিত্যাগ করতে বললেন।

সাথে সাথে আমাদের কে নির্দেশ দিলেন সত্য কথা বলতে, আমানত আদায় করতে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করতে, হারাম থেকে বেঁচে থাকতে।

এবং আমাদেরকে নিষেধ করলেন অযথা রক্তপাত করতে, যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে, মিথ্যা কথা বলা থেকে এবং এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে। ফলে আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম এবং তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনলাম এবং তাঁর আনিত দ্বীনের অনুসরণ করলাম।

এখন আমরা শুধু এক আল্লাহ্র ইবাদত করি। যাঁর কোন শরীক নেই। তিনি যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করি এবং তিনি যা হালাল করেছেন তাকেই শুধু হালাল মনে করি।

ফলে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল, আমাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করল এবং আমাদেরকে সত্য দ্বীন থেকে মূর্তিপূজার দিকে ঠেলে দেবার জন্য আমাদের উপর অবর্ণনীয় জুলুম অত্যাচার করতে লাগল। তাই যখন তারা আমাদের উপর বল প্রয়োগ করল আমাদের উপর অত্যাচার করল। চতুর্দিক আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে তুলল সর্বোপরি যখন তারা আমাদের ও আমাদের দ্বীনের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াঁল...

তখন আমরা আপনার আশ্রয়ে এবং আপনার রাজ্যে বসবাস করতে ইচ্ছা করলাম।

অন্যকে বাদ দিয়ে আমরা আপনাকেই নির্বাচন করেছি কারণ আমরা জানতে পেরেছি আপনি ন্যায় পরায়ণ, আপনি ইনসাফ করেন। আমরা আপনার কাছে অত্যাচারিত হব না।

নাজাশী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নবী তোমাদের জন্য যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা কি তোমাদের মুখস্ত আছে ?

হযরত জাফর (রাযি.) বললেন হ্যাঁ।

নাজাশী বললেন ঃ তাহলে আমাকে পড়ে শুনাও

তখন হযরত জাফর (রাযি.) সূরায়ে মারইয়ামের শুরুর কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا

হে নবী! এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল। তারপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করবার জন্য সে পর্দা করল।

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

তারপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম সে তার নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।

قَالَتْ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

মরিয়াম বলল ঃ আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি যদি তুমি আল্লাহ্‌ভীরু হও।

قَالَ إِنَّمَاأَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

আমি তোমার পালন কর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দিয়ে যাই।

قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا

মারইয়াম বলল ঃ কিভাবে আমার পুত্র হবে অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিনীও নই।

قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا

সে বলল ঃ এমনিতেই হবে তোমার পালনর্কতা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন এবং আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। আর এটা তো এক স্থিরীকৃত বিষয়।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا

তারপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষের কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন হায়! আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিস্মৃত হয়ে যেতাম!!

فَنَادَاهَامِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

তারপর ফেরেশতা তাকে নিম্ন দিক থেকে আওয়ায দিলেন, তুমি দুঃখ করো না তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারী করেছেন। (সূরায়ে মারইয়াম ১৬-২৪)

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো শুনে নাজাশী কেঁদে ফেললেন, চোখের পানিতে সিক্ত হল তার দাড়ী...

সাথে সাথে পাদ্রীরাও কেঁদে ফেলল এমনকি চোখের অশ্রুতে তাদের সামেন রাখা নথি-পত্রগুলো ভিজে গেল...

তখন নাজাশী আমর ইবনুল আস এবং তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

আমরা এখন যা শুনলাম এবং হযরত ঈসা (আ.) যা নিয়ে আগমন করেছেন তা একই উৎস থেকে উৎসারিত।

তারপর বললেন, আল্লাহ্র কসম আমি কিছুতেই তোমাদের হাতে তাদেরকে তুলে দিব না এবং যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকব ততদিন পর্যন্ত তাদেরকেও যেতে বলব না।

তারপর নাজাশী ওঠে গেলেন। সাথে সাথে অন্যান্যরাও চলে গেল। এবং সেদিনের মত সভা সমাপ্ত হল।

*   *   *

আমর ইবনুল আস দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসল। তখন যেন সে ক্রোধে ফেটে পড়ছিল। তার চোখ থেকে যেন ক্রোধাগ্নী ঠিকরে পড়ছিল। ক্রোধে সে তার সঙ্গীকে বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! আগামীকাল আমি আবার নাজাশীর সাথে দেখা করব এবং এমন সব বিষয় সম্পর্কে তাকে অবহিত করব যার কারণে তিনি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে রায় দিবেন আর তারা তখন সমূলে উৎপাটিত হবে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী রবীআ ছিলেন নরম দীলের মানুষ। তিনি বললেন ঃ আমর! এরূপ করো না।

কারণ, যদিও তারা ধর্মীয় বিশ্বাসে আমাদের পরিপন্থী তবুও তো তাদের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।

আমর বলল ঃ আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমি নাজাশীকে বলে দিব যে তারা মারইয়াম তনয় ঈসা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকে

এবং তারা তার সম্পর্কে কিছু বিষয় গোপন রাখে

এবং তারা তাকে বিভিন্ন অপবাদ দেয় আর বলে যে তিনি নাকি আব্দুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র বান্দা।

তাই পরের দিন আমর আবার গেল নাজাশীর কাছে এবং বলল ঃ

হে মহামান্য সম্রাট! গতকাল তারা আপনাকে তাদের ধর্মের কিছু কথা শুনিয়েছে আর কিছু কথা গোপন করে রখেছে ...

তারা তো হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলে যে তিনি নাকি আবদ তথা বান্দা ...

তাই নাজাশী আবার তাদেরকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি ?

তখন হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাযি.) বললেন, তার সম্পর্কে আমাদের নবী যা নিয়ে আগমন করেছেন আমরা তাই বলি।

নাজাশী জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের নবী তার সম্পর্কে কি নিয়ে এসেছেন ?

হযরত জাফর (রাযি.) তখন বললেন ঃ তিনি আল্লাহ্র বান্দা এবং তার রাসূল এবং তার বানী যা তিনি পূঁত পবিত্র হযরত মারইয়মের কাছে প্রেরণ করেছেন।

নাজাশী তখন বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তুমি যা বলেছ ঈসা (আ.) তার চেয়ে বিন্দু পরিমাণ বেশী কিছু ছিলেন না।

নাজাশীর কথায় সভাসদবর্গ পরস্পরে কানা ঘুষা করতে লাগল এবং নাজাশীর কথার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল।

বিষয়টি নাজাশীর দৃষ্টিতেও পড়ল, তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন যদিও তোমরা আমার কথা অপছন্দ করছ কিন্তু এ কথাই ঠিক।

এরপর নাজাশী হযরত জাফর (রাযি.) এবং তার সঙ্গীদেরকে বললেন যাও তোমরা আমার রাজ্যে সম্পূর্ণ নিরাপদ...

যে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে

পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়েও আমি তোমাদেরকে সামান্যতম কষ্ট দিতে রাজি নই।

তারপর তিনি সভাসদদের বললেন, আমর এবং তার সঙ্গীর উপঢৌকন তাদেরকে ফিরিয়ে দাও, তাদের উপঢৌকন আমার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ্ যখন আমাকে আমার রাজ্যে ফিরিয়ে এনেছেন তখন আমার কাছ থেকে তিনি কোন ঘুষ নেননি। তবে আমি কেন অন্যের কাছ থেকে ঘুষ নিব ?

নাজাশীর সভাসদবর্গ মানুষের মাঝে প্রচার করতে লাগল যে বাদশাহ আপন ধর্ম ত্যাগ করেছেন এবং তার পরিবর্তে অন্য আরেক ধর্ম গ্রহণ করেছেন

তাই তারা নাজাশীর আনুগত্য বর্জন করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানাল ...

ফলে হাবশার জনগণ নাজাশীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল এবং তার আনুগত্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিল।

তাই নাজাশী সমস্ত খবর জানিয়ে হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রাযি.) এবং তার সঙ্গীদের কাছে দূত পাঠালেন।

এবং তাদের জন্য কয়েকটি জাহাজ প্রস্তুত করে রাখলেন।

এবং দূতের মাধ্যমে তাদেরকে বলে দিলেন তোমরা জাহাজ গুলোতে আরোহন কর এবং যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য প্রস্তুতি নাও।

যদি আমি পরজিত হই তাহলে যেখানে খুশী সেখানে তোমরা চলে যেও

আর যদি আমি জয় লাভ করি তাহলে আগে যেভাবে ছিলে সে ভাবেই থাকবে।

এরপর তিনি এক টুকরো হরিণের চামড়া আনলেন এবং তাতে লিখলেন

اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَخَاتِمُ رُسُلِهٖ

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও সর্বশেষ রাসূল।

وَاَشْهَدُاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَرُوْحُهٗ وَكَلِمَتُهُ الَّتِىْ اَلْقَاهَااِلٰى مَرْيَمَ

এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল এবং তার রুহ ও বাণী যা তিনি মারইয়াম (আ.)-এর কাছে পাঠিয়েছেন।

এর পর চামড়ার টুকরোটি নিজের বুকের সাথে বেধে রাখলেন এবং তার উপর শেরওয়ানী পড়লেন। অতপর তার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছে তাদের কাছে গেলেন।

তাদের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বললেন ঃ

হে হাবশার অধিবাসী! তোমাদের মাঝে আমার আখলাক চরিত্র কেমন দেখলে

তারা বলল ঃ আপনার চরিত্র-উত্তম চরিত্র

নাজাশী জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহ্লে কিসে তোমাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল ?

লোকজন বলল ঃ আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন আর দাবী করছেন যে ঈসা (আঃ) আবদ তথা বান্দা।

নাজাশী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঈসা (আ.) সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি?

তারা বলল ঃ তিনি তো আল্লাহ্র পুত্র।

তখন তিনি শেরওয়ানীর নীচে বুকের সাথে বাধা চামড়ার উপর হাত রাখলেন এবং সেদিকে ইশারা করে বললেন ঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত ঈসা (আ.)-এরচে বেশী কিছু নন। (নাজাশীর উদ্দেশ্য ছিল সেই চামড়ার লিখিত কথা)

এই কৌশল অবলম্বন করায় তার সবাই খুশী হয়ে গেল এবং শান্ত হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে গেল।

* * *

নাজাশী এবং তার প্রজাদের মাঝে ইতোমধ্যে যা ঘটে গেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সম্পর্কে অবগত হলেন।

এবং যে সকল মুসলমান তার রাজ্যে হিজরত করে নিরাপদে নিশ্চিন্তে বসবাস করছে তাদের দিকে তার বিশেষ নজর ও তত্ত্বাবধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

ইসলামের প্রতি তার আনুগত্য এবং কুরআনের বানীর বিশুদ্ধতার প্রতি তার বিশ্বাসের খবর শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার মাঝে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল।

সপ্তম হিজরীর প্রথম মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন পৃথিবীর ছয়জন সম্রাট এবং তাদের গর্ভনরদেরকে আল্লাহ্র দ্বীন গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিতে মনস্থ করলেন।

তাই ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করে তাদের প্রত্যেকের কাছে পত্র লিখলেন।

ঈমানের সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং কুফর ও শিরক থেকে তাদেরকে সতর্ক করলেন।

এ উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট ছয়জন সাহাবীকে নির্বাচন করেছিলেন।

তাই তাদের প্রত্যেকেই যে সম্রাটের কাছে যাবেন তিনি তাদের ভাষা শিখে নিলেন।

তারপর এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য একই দিনে তারা সকলেই বের হয়ে পড়লেন।

ছয়জনের মধ্যে আমর ইবনে উমাইয়্যা যুমারী ছিলেন সেই মহান ব্যক্তি যিনি হাবশার বাদশাহ্র কাছে গিয়েছিলেন।

* * *

আমর ইবনে উমাইয়া নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ইসলামী আদব কায়দায় তাকে অভিবাদন করলেন। বাদশাহ্ নাজাশীও তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিলেন।

যখন নাজাশীর দরবার বসল তখন আমর তার সামনে নবীজীর পবিত্র পত্র এগিয়ে দিলেন। পত্র হাতে নিয়েই নাজাশী তা খুলে পড়তে লাগলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান করেছেন।

পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতও লিখে দিয়েছেন চিঠিতে

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রের সম্মানার্থে নাজাশী তা কপালে ছুঁয়ালেন ...

এবং পত্রের সম্মানার্থে বিনয়-নম্র হয়ে সিংহাসন থেকে নেমে পড়লেন

তারপর তার কতিপয় সভাসদের উস্থিতিতে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন।

এবং বললেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাওয়া যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত তাহলে অবশ্যই আমি তার খিদমতে উপস্থিত হতাম...

তার সামনে হাটু গেড়ে বসতাম...

এবং তার পবিত্র পদতলে আমার মাথা রাখতাম

অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছোট্ট একটি পত্র লিখলেন। এবং নবীজীর দাওয়াত কবুল করার কথা জানিয়ে দিলেন...

এবং তার নবুওয়াতের প্রতি পূর্বেই আনা ঈমানের প্রকাশ করলেন...

এমন সময় আমর ইবনে উমাইয়্যা নবীজীর আরেকটি পত্র বের করলেন। সে পত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন যেন তিনি রমলা বিনতে আবী সুফিয়ান কে নবীজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

উম্মুল মুমিনীন রমলা বিনতে আবী সুফিয়ান এর উপনাম হল উম্মে হাবীবা তার জীবনের শুরুভাগটা ছিল দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ...

কিন্তু জীবনের শেষ ভাগ ছিল আনন্দ উচ্ছাসে পূর্ণ তাই এসো অল্প সময়ে আমরা তার ঘটনাটাও জেনে নেই।

*　　*　　*

রমলা তার পিতা কোরাইশ নেতা আবু সুফইয়ানের ইলাহের প্রতি অস্বীকৃতি জানালেন এবং তিনি স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ সহ এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলেন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন।

যার ফলে কোরাইশরা ক্রুদ্ধ হল এবং তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করল।

এবং তাদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দিতে লাগল যে মক্কায় থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল।

তাই দ্বীন ঈমান নিয়ে হিজরত করে যারা নাজাশীর কাছে আশ্রয় নিয়েছেন তারা দুজনও তাদের সাথে চলে এসেছেন।

সেখানে অন্যান্য মুহাজির ভাইদের মত তারাও বাদশাহ নাজাশীর দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করলেন।

এবার উম্মে হাবীবা মনে করলেন যে তার জীবনাকাশ আবার স্বচ্ছ হতে চলেছে।

কারণ সে তো জানে না তার তাকদীর তার জন্য কি ফয়সালা করে রেখেছে।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা চাইলেন উম্মে হাবীবাকে এমন কঠিন পরীক্ষা করতে যাতে বুদ্ধি বিবেক পেরেশান না হয়ে পারে না।

তাই দেখা গেল কিছু দিন যেতে না যেতেই তার স্বামী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল।

এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল।

এরপর থেকে সে নিয়মিত মদ্যপায়ীদের আড্ডায় যেতে লাগলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল এবং সবচে নিকৃষ্টতম কাজগুলো করতে লাগল।

কিন্তু কিছুতেই তার তৃপ্তি আসছিল না।

আর সে তার স্ত্রী রমলাকে দুটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দিল...

হয় সে তালাক গ্রহণ করবে।

নয় খ্রিষ্টান হয়ে যাবে।

* * *

এখন উম্মে হাবীবার সামনে তিনটি পথ খোলা আছে।

হয়তো তিনি আপন স্বামীর ডাকে সাড়া দিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যাবেন। আর এটা করলে দুনিয়ার লাঞ্ছনা যেমন ভোগ করতে হবে তেমনি পরকালের শাস্তির ও শিকার হতে হবে...

অথবা মক্কায় পিতার কাছে চলে আসবেন। কিন্তু পিতার গৃহ যে শিরকের আড্ডাখানা...

অথবা একমাত্র ছোট্ট মেয়ে হাবীবাকে নিয়ে হাবশাতে একাকীই থেকে যাবেন...

সব শেষে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিলেন।

এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত হাবশাতে থাকারই প্রতিজ্ঞা করলেন।

* * *

কিন্তু উম্মে হাবীবার এই হতাশা বেশী দীর্ঘায়িত হল না, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বামী মাতাল হয়ে জীবন লীলা সাঙ্গ করল।

এরপর উম্মে হাবীবার ইদ্দত পুরা হতে না হতেই আনন্দের বন্যা তার দিকেই বয়ে এলো।

তাই তো একদিন এক উজ্জল সকালে তার ঘরের দরজায় করাঘাতের আওয়াজ হল। দরজা খুলেই উম্মে হাবীবা দেখতে পেলেন নাজাশীর দূত দাড়িয়ে। দূত তাকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন ঃ

বাদশাহ নাজাশী আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। এবং বলেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

এবং বিয়ের আকদের জন্য তিনি স্বয়ং বাদশাহকে উকীল নিযুক্ত করেছেন

অতএব, আপনার পক্ষ থেকে যাকে ইচ্ছা উকীল নিযুক্ত করুন।

উম্মে হাবীবা আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন...

এবং আনন্দ গদগদ কণ্ঠে বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিন...

এরপর বললেন ঃ আমি খালিদ ইবনে সাঈদকে আমার পক্ষ থেকে উকীল নিযুক্ত করলাম কেননা এ ভিন দেশে তিনিই আমার সবচে নিকটের।

* * *

আজ নবীজীর সাথে উম্মে হাবীবার বিয়ে। তাই রাসূলের সাথে তার বিয়ের আকদ দেখার জন্য হাবশায় অবস্থানরত মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম নাজাশীর প্রাসাদে সমবেত হয়েছেন।

একে একে যখন সবাই এসে উপস্থিত হল তখন নাজাশী প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন তারপর বললেন ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে দূত পাঠিয়েছেন যেন আমি রমলা বিনতে আবী সুফইয়ানকে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেই। তাই আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছি।

এবং নবীজীর পক্ষ থেকে মহর স্বরূপ চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাকে প্রদান করলাম। তারপর খালিদ ইবনে সাঈদ এসে দাড়ালেন এবং হামদ ও সানার পর বললেন ঃ

আমি ও নবীজীর এই আহবানে সাড়া দিলাম।

এবং রমলা বিনতে আবী সুফইয়ানকে তাঁর কাছে বিয়ে দিলাম।

হে আল্লাহ্! তুমি নবীজী এবং তার স্ত্রীর মাঝে ররকত দান কর।

এবং ধন্যবাদ রমলা বিনতে আবী সুফইয়ানকে আল্লাহ্ যাকে এতবড় নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন।

* * *

নাজাশী দুটি জাহাজ প্রস্তুত করলেন।

এবং তাতে উম্মুল মুমিনীন রমলা বিনতে আবি সুফইয়ান তার কন্যা হাবীবাসহ অপরাপর সকল মুহাজির মুসলমানদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন।

সাথে সাথে হাবশার ঐ সকল লোকদেরকেও পাঠালেন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন...

এবং অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষার প্রহর গুণছেন নবীজীর সাথে সাক্ষাতের জন্য...

এবং তাঁর সংস্পর্শে থাকার জন্য...

হযরত জাফর ইবনে আবী তালিবকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন।

এবং নাজাশীর স্ত্রীদের কাছে রক্ষিত সর্ব প্রকার জাফরান মিশক আম্বর এবং সুগন্ধি রমলাকে হাদীয়া দিলেন।

সাথে সাথে নবীজীর জন্যও কিছু হাদীয়া তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

সেগুলোর মধ্যে ছিল হাবশার আকর্ষণীয় তিনটি ছড়ি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে তিনটি ছড়ি থেকে একটি নিজের জন্য রাখলেন। আর বাকী দুটি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব এবং হযরত আলী ইবনে আবী তালিবকে দিলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য যে ছড়িটি রেখেছিলেন হযরত বিলাল হাবশী সেটি নিয়ে নবীজীর সামনে চলতেন এবং নামাযে তা দিয়ে সুতরার কাজ নিতেন।

তবে তা ছিল ঐ সকল এলাকায় যেখানে কোন মসজিদ বা ঘড়বাড়ী ছিল না যার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করা যায়।

এবং নবীজীর সফরে...

দুই ঈদ এবং ইসতিসকার নামাযেও

নবীজীর ইন্তেকালের পর হযরত বিলাল (রাযি.)

সেটি নিয়ে আবু বকরের (রাযি.) সামনে চলতেন।

এরপর খেলাফত যখন হযরত উমর (রাযি.) এবং পরে হযরত উসমান (রাযি.)-এর হাতে অর্পিত হল তখন এই ছড়িটি নিয়ে তাদের সামনে সামনে থাকতেন হযরত সাদ আল কুরাযী।

পরবর্তী খলীফাগণও দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।

এছাড়াও নাজাশী নবীজীর জন্য মূল্যবান অলংকার পাঠিয়েছিলেন যার মাঝে স্বর্ণের আংটিও ছিল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করেছেন যদিও তা থেকে তিনি বিমুখ ছিলেন। এরপর তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যয়নবের কন্যা উমামার কাছে এবং বলে দিয়েছিলেন যে এটা পড়ে তুমি সেজে নাও।

* * *

মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে নাজাশী আপন পালকর্তার সান্নিধ্যে চলে গেলেন

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বললেন ঃ

তোমাদের ভাই নাজাশী ইন্তেকাল করেছেন। তোমরা তার জানাযার নামায পড়।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইমামতিতে সাহাবায়ে কেরাম তার গায়েবানা জানাযা আদায় করলেন।

অথচ নাজাশীর আগে ও পড়ে কারও জন্য তিনি গায়েবানা জানাযার নামায পড়েননি...

* * *

আল্লাহ নাজাশীর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করুন।

এবং চিরস্থায়ী জান্নাতকে তার আশ্রয় স্থল বানান।

কারণ; তিনি চরম সংকটের সময় মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। তাদের শক্তি যুগিয়েছেন...

এবং ভয় ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

আর এসব তিনি করেছেন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য।

আবুল আলীয়া রুফাই ইবনে মিহরান (রহ.)

বসরায় সাহাবায়ে কেরামের পর কুরআন সম্পর্কে
আবুল আলীয়ার চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ কেউ
ছিলেনা না। তার পরের স্থান ছিল সাঈদ
ইবনে জুবাইরের।

—আবু বকর ইবনে দাউদ।

আবুল আলীয়া রুফাই ইবনে মিহরান (রহ.)

হযরত রুফাই ইবনে মিহরান। উপমান আবুল আলীয়া। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন।

ছিলেন ক্বারী ও মুহাদ্দিসগণের অন্যতম তাবেয়ীদের মধ্যে কিতাবুল্লাহ্র ব্যাপারে তিনিই ছিলেন সবচে বিজ্ঞ।

নবীজীর হাদীসের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন সবচে জ্ঞানী।

কুরআন বুঝা এবং তার গভীরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবচে পারঙ্গম এবং কুরআনের রহস্য ও মমার্থ উদঘাটনে ছিলেন অতুলনীয়।

তাই এসো আমরা এই মহান মনীষীর জীবনী নিয়ে আলোচনা করি।

কেননা তার জীবন ছিল চমৎকার ঘটনাবলী ও আকর্ষনীয় চিত্রে পরিপূর্ণ...

এবং মূল্যবান নসীহত ও উপদেশে ভরপুর...

*　　*　　*

হযরত রুফাই ইবনে মিহরান (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন পারস্যে। সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন। এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। পারস্যবাসীকে কুফুরির অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য মুসলমানগণ যখন তাদের রাজ্যে আক্রমন করেন তখন এই রুফাই ইবনে মিহরান ছিলেন সে সকল যুবকদের একজন যারা দয়ার্দ্র মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন এবং তাদের কল্যানময় পরিবেশে এসেছিলেন।

এর অল্প কিছু দিন পরেই তিনি এবং তার সঙ্গীগণ ইসলামের সুউচ্চ মর্যাদা এবং তার মহিমা সম্পর্কে জানতে পারলেন...

এবং তারা ইসলাম ও মূর্তি পূঁজার মধ্যে তুলনা করার সুযোগ পেলেন।

ফলে তারা দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগলেন...

তারপর তারা কিতাবুল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করলেন...

এবং নবীজীর বাণীর অমীয় সুধা পান করে তৃপ্ত হতে লাগলেন...

* * *

হযরত রুফাই (রহঃ) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

আমি এবং আমার গোত্রের কতিপয় লোক মুজাহিদদের হাতে বন্দী হই। বন্দী হবার কিছুদিন পরই একদল মুসলমানের গোলাম হিসাবে বসরায় চলে যাই।

এর কিছুদিন পরেই আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম...

এবং কিতাবুল্লাহ্‌র হিফজের প্রতি মনোনিবেশ করলাম...

আমাদের কেউ কেউ তার মনীবের কর আদায় করত...

আর কেউ কেউ তাদের খেদমত করত...

আর আমিও ছিলাম তাদেরই একজন।

সে সময় আমরা প্রতিরাতে একবার কুরআন খতম করতাম। কিন্তু তা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাড়াল...

তাই আমরা প্রতি দুইরাতে একবার খতম করতাম কিন্তু তাও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল...

ফলে আমরা প্রতি তিন রাতে একবার খতম করতে লাগলাম কিন্তু সেটাও আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

কেননা, দিনের বেলায় আমরা কঠোর পরিশ্রম করতাম...

এবং রাতে দীর্ঘক্ষণ জেগে থাকতাম...

ইত্যবসরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাদের কাছে রাত জেগে কিতাবুল্লাহ তিলাওয়াত করার মেহনতের অনুযোগ করলাম।

তারা আমাদেরকে প্রতি সাত দিনে একবার কুরআন খতম করার পরামর্শ দিলেন। তখন থেকে আমরা এ পরামর্শ মুতাবিকই আমল করতে শুরু করলাম...

রাতের একাংশ কুরআন তিলাওয়াত করতাম বাকী অংশ ঘুমাতাম।

ফলে তখন থেকে আর এটা আমাদের জন্য কষ্টকর হতনা।

* * *

এদিকে বনী তামীম গোত্রের জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা রুফাই ইবনে মিহরান সম্পর্কে জানতে পারলেন ফলে তিনি তাঁকে খরীদ করে নিলেন। এই মহিলা ছিলেন সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিমতি। তাকওয়া ও ঈমানের নূরে পরিপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী...

রুফাই ইবনে মিহরান দিনের কিছু অংশ তার সেবায় কাটাতেন আর বাকী সময় বিশ্রাম করতেন।

এবং এই অবসরে সময় লেখাপড়া শিখতেন। এবং তাতে যথেষ্ট পারদর্শীতা অর্জন করলেন এবং এর মাঝ দিয়েই দ্বীনের কিছু ইলমও অর্জন করে ফেললেন কিন্তু তা করতে গিয়ে স্বীয় মনীবের হক আদায়ে সামান্যতম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতেন না।

* * *

একবারের ঘটনা। এক জুমুআর দিনে রুফাই ইবনে মিহরান সুন্দরভাবে উযূ করলেন।

তারপর মসজিদে যাবার জন্য তার মনিবের কাছে অনুমতি চাইলেন

মনিব জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় যাবে রুফাই ?

রুফাই বললেন ঃ মসজিদে যেতে চাই।

মনিব বললেন ঃ কোন মসজিদে যাবে তুমি ?

রুফাই বললেন ঃ জামে মসজিদে।

মনিব বললেন ঃ তাহলে আমাকেও সাথে নিয়ে যাও।

এরপর দুজনেই চলতে লাগলেন এবং অন্যান্যদের সাথে তারাও মসজিদে প্রবেশ করলেন। কিন্তু রুফাই ঘুনাক্ষরেও টের পেলেন না যে তার মনিব কি উদ্দেশ্যে তার সাথে মসজিদে এসেছেন।

যখন লোকজন মসজিদে ভরে গেল এবং খুতবা দেওয়ার জন্য ইমাম সাহেব মিম্বারে উঠলেন, তখন রুফাই এর হাত ধরে তার মনিব বলে উঠল ঃ

হে মুসলমানগণ! তোমরা সাক্ষী থেকো আমি আমার এই গোলাম কে আযাদ করে দিলাম...

আল্লাহ্র কাছ থেকে সওয়াব ও বিনিময়ের আশায়...

এবং তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি কামনায়...

আর এখন থেকে ন্যায়সঙ্গত দাবী ব্যতীত তার উপর কারো কোন কর্তৃত্ব চলবে না।

তারপর তিনি রুফাই এর দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ

হে আল্লাহ্! আমি সেদিনের জন্য তাকে তোমার কাছে জমা রাখলাম যে দিন ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না...

নামায শেষে রুফাই নিজের পথ ধরলেন।

তার মনিব ও আপন পথ ধরে চলে গেলেন নিজ গৃহের দিকে।

* * *

সেদিনই রুফাই (রহ.) মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন

এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন। এটা ছিল খলীফার ইন্তেকালের অল্প কিছু দিন পূর্বে।

এমনিভাবে তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযি.)-এর সংস্পর্শে এসেও ধন্য হয়েছেন। এবং তাঁর কাছে কিতাবুল্লাহ পড়েছেন। তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছেন।

* * *

হযরত আবুল (রহ.) আলীয়া কিতাবুল্লাহ্র প্রতি যেমন ঝুঁকেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের প্রতিও তিনি গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন।

তাই তো যে সকল মহান তাবেয়ীর সাথে বসরায় তার সাক্ষাত হতো তাদের কাছ থেকে তিনি হাদীস শুনতেন।

কিন্তু অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই তার হৃদয় তাবেয়ীদের চেয়ে আরও উন্নত আরও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি আকৃষ্ট হল।

তাই সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র যবান থেকে হাদীস শোনার জন্য তিনি বার বার মদীনায় আসতে লাগলেন।

যার ফলে হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাঁর ও রাসূলের মাঝে একজন মাত্র ব্যক্তি মাধ্যম ছিলেন। আর তিনি কোন না কোন সাহাবী।

এভাবেই তিনি হাদীস গ্রহণ করলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে হযরত উবাই ইবনে কাব (রাযি.) থেকে, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযি.) হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীদের থেকে...

আর হযরত আবুল আলীয়া (রহ.) নিজ শিক্ষাকে মদীনায় হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। বরং সব যায়গাতেই তিনি নবীজীর হাদীস খুঁজে বেড়াতেন।

যখনই তিনি কোন বিশেষজ্ঞ আলিমের সন্ধান পেতেন তা যেখানেই হোক না কেন, তিনি তাঁর কাছে চলে যেতেন।

সেখানে পৌঁছেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়তেন।

যদি দেখতেন যে তিনি সুন্দরভাবে এবং একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করছেন না

এবং যথাযথভাবে নামাযের হক আদায় করছেন না তখন তাঁর থেকে ফিরে আসতেন এবং মনে মনে বলতেন,

যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে শিথীলতা করে সে তো অন্যান্য বিষয়ে আরও বেশী শিথীলতা করবে।

তাই তিনি তাঁর সামানাদী নিয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে যেতেন...

* * *

ইলম সাগরের এতো গভীরে আবুল আলীয়া পৌছে ছিলেন যে সমকালীন সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এ সম্পর্কীয় অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

একবারের ঘটনা সম্পর্কে আবুল আলিয়ার একজন ছাত্র বলেন ঃ আবুল আলীয়াকে উযূ করতে দেখলাম, উযূ করার সময় তাঁর চেহারা এবং হাত থেকে পানি টপকে পড়ছিল।

পবিত্রতা তার প্রতিটি অঙ্গে ঝলমল করছিল।

আমি তাকে স্বাগত জানালাম এবং বললাম ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারী এবং পবিত্রতাঅর্জনকারীদের ভালবাসেন।

আবুল আলীয়া তখন বললেন ঃ

হে আমার ভাই! বাহ্যিক নাপাকী থেকে যারা পবিত্রতা অর্জন করে তারা প্রকৃত পবিত্র নয়।

প্রকৃত পবিত্র তো তারাই যারা তাকওয়া অবলম্বন করে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে।

আমি তাঁর কথা শুনে ভাবতে লাগলাম এবং বুঝতে পারলাম যে তিনি ঠিকই বলেছেন। আর আমি ভুল করেছি।

তাই আমি তাঁকে বললাম ঃ "জাযাকাল্লাহু খাইরান"

আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং আপনার ইলম ও বুঝশক্তি বাড়িয়ে দিন।

* * *

মানুষকে ইলম অন্বেষনে উদ্বুদ্ধ করা তিনি অভ্যাসে পরিণত করে নিয়ে ছিলেন। এজন্যই তিনি লোকজনকে ইলম অর্জনে উৎসাহ্ দিতেন এবং ইলম অর্জনের পথ ও পন্থা বলে দিতেন, এবং তিনি আর বলতেন ঃ

ইলম অর্জনে তোমরা নিজেদেরকে বিলিয়ে দাও এবং ইলমের জন্য বেশী বেশী জিজ্ঞেস কর।

আর জেনে রেখো ইলম অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল।

সে কোন অহেতুক লজ্জাশীল কিংবা অহংকারীর জন্য তার ডানাকে অবনমিত করে না...

কেননা অহেতুক লজ্জাশীল ব্যক্তি তার লজ্জার কারণে জিজ্ঞেস করতে পারে না...

আর অহংকারী তার অহংকারের কারণে জিজ্ঞেস করে না...

কুরআন শিখতে এবং কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে তিনি তার ছাত্রদেরকে উৎসাহ দিতেন এবং কুরআনের বিষয়াবলীকে আকড়ে ধরতে এবং বিদআতপন্থীদের বিদআত থেকে দূরে থাকতে প্রেরণা যোগাতেন...

তাই তো তিনি বলতেন ঃ তোমরা কুরআন অধ্যয়ন কর...

যখন কুরআন ভালভাবে শিখে নিবে তখন কুরআন থেকে বিমুখ হয়ো না...

সীরাতে মুস্তাকীম তথা সরল সঠিক পথকে তোমরা আকড়ে ধর। আর সরল-সঠিক পথই তো ইসলাম...

আর যাবতীয় কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে তোমরা বেঁচে থাক কেননা এগুলো তোমাদের পারস্পারিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে।

এবং সাহাবায়ে কিরাম যার উপর অটল অবিচল ছিলেন তোমরাও তার উপর জমে থাকো। কখনও তা থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হয়ো না...

আবুল আলীয়ার এই মূল্যবান উপদেশ তার ছাত্ররা হাসান বসরীকে শুনালে তিনি বললেন ঃ

আল্লাহ্‌র কসম আবুল আলীয়া তোমাদেরকে মূল্যবান নসীহত করেছেন এবং তিনি সত্যই বলেছেন।

এমনিভাবে আবুল আলীয়া তার ছাত্রদেরকে কুরআন হিফজের তাকীদ দিতেন এবং তার পন্থাও বলে দিতেন। তিনি বলতেন ঃ

তোমরা পাঁচ আয়াত করে কুরআন শিখতে থাক। কেননা এটা তোমাদের মেধা ও স্মৃতিশক্তির জন্য অতি সহজ...

এবং তোমাদের সমঝ ও বুঝ শক্তির জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী পন্থা...

তাছাড়া হযরত জিব্রাঈল (আ.) পাঁচ আয়াত করে নবীজীর উপর নাযিল করতেন।

* * *

আবুল আলীয়া ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক।

তিনি তার ছাত্রদের চিন্তা-চেতনাকে ভরে দিতেন উপকারী ইলম দ্বারা...

এবং তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে দিতেন উত্তম উপদেশাবলী দ্বারা...

অনেক সময় তিনি একই সাথে দুটি বিষয়ের সমন্বয় সাধন করতেন।

তাইতো তিনি তার ছাত্রদেরকে বলতেন ঃ আল্লাহ তায়ালা নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন,

যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে তাকে হিদায়েত করবেন...

এই কথাটাই প্রতিধ্বণিত হয় পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন।

তিনি আরও বলতেন ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন.....

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি ছিল তার একথার উৎস

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করবে আল্লাহ্-ই তার জন্য যথেষ্ট।

তিনি আরও বলতেন ঃ

যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য দান করবে আল্লাহ্ তাকে তার বিনিময় দিবেন...

তাঁর এই কথার উৎস ছিল পবিত্র কুরআনের এই আয়াত

مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

"এমন কে আছে যে আল্লাহ্‌কে করয দিবে। উত্তম করয আর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিবেন।

তিনি আরও বলতেন ঃ

যে আল্লাহ্‌কে ডাকবে আল্লাহ্ তার ডাকে সাড়া দিবেন...

নিম্নোক্ত আয়াত থেকেই তার এই কথা প্রতিধ্বনিত হয় ঃ

وَاِذَا سَئَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَادَعَانِىْ

" আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে আমি তো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে তখন আমি তার আহবানে সাড়া দেই।"

তিনি তাঁর শাগরিদদেরকে বলতেন ঃ

আনুগত্যের সাথে তোমরা আমল কর এবং আনুগত্যকারীদের প্রতি তোমরা মনোনিবেশ কর। গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। এবং গোনাহগারদের সাথে তাদের গোনাহের কারণে শত্রুতা কর...

তারপর গোনাহগারদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতেই ছেড়ে দাও। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করতেও পারেন আর ইচ্ছা হলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন।

যখন তোমরা দেখবে কোন ব্যক্তি নিজের মর্যদা বাড়িয়ে বলছে ঃ

'আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যেই অমুককে ভালবাসি এবং আল্লাহ্‌র জন্যেই ঘৃণা করি'

এবং 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই অমুককে প্রধান্য দেই এবং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়েই অমুক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই'...

তাহলে তোমরা তার কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করো না।

* * *

হযরত আবুল আলীয়া (রহ.) শুধু আমলদার আলেম এবং সদুপদেশদানকারী একজন পথ প্রদর্শক ছিলেন না বরং তিনি একজন মুজাহিদও ছিলেন।

তিনি কিছু সময় মুজাহিদদের সাথে জিহাদের ময়দানে কাটাতেন...

অথবা সীমান্তরক্ষীদের সাথে সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত থাকতেন।

জিহাদের জন্য পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলকে তিনি প্রধান্য দিয়েছিলেন এবং তার প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

তাইতো তিনি শাম অঞ্চলে রোমের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

যেমনিভাবে মাওয়ারাউননাহার অঞ্চলে পারস্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন...

তিনিই সেই মহান ব্যক্তি যিনি সর্ব প্রথম সে অঞ্চলে সর্বপ্রথম আযানের আওয়াজ বুলন্দ করেন।

যখন হযরত আলী (রাযি.) এবং হযরত মুআবিয়া (রাযি.) এর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল তখন আবুল আলীয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন ঃ যখন হযরত আলী (রাযি.) এবং হযরত মুআবিয়া (রাযি.) এর মধ্যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল তখন আমি ছিলাম পূর্ণ সুস্থ এবং পূর্ণ উদ্যম ছিল আমার মাঝে।

সে সময় যুদ্ধ ছিল আমার কাছে প্রচন্ড গরমের সময় সুমিষ্ট ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয়।

আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলাম এবং তাদের কাছে আসলাম।

তখন আমি আমার চোখের সামনে এতো বিশাল দুটি সারি দেখতে পেলাম যার শেষ মাথা দেখা যাচ্ছিল না।

যখন একদল "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিচ্ছিল তখন অপর বাহিনীও "আল্লাহু আকবার" বলছিল...

যখন কোন এক বাহিনী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছিল...

তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ

দুই বাহিনীর কাকে আমি কাফের বলব এবং কার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব ?

এবং কাকে মুমিন বলব এবং তার পক্ষ হয়ে জিহাদ করব ?

তাই আমি উভয় বাহিনীকে ছেড়ে চলে আসলাম।

* * *

আবুল আলীয়া সমগ্র জীবনটাই দুঃখ বেদনা এবং আফসোস ও পরিতাপের মাঝ দিয়েই কাটিয়েছেন, কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে পারেননি...

একারণেই তিনি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের নৈকট্য লাভের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর।

এজন্য সর্বক্ষেত্রে তাদেরকেই তিনি প্রাধান্য দিতেন এবং তাদেরকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। আর সাহাবায়ে কেরামও তাকে প্রাধান্য দিতেন এবং তার যোগ্যতার মূল্যায়ন করতেন।

এধরনের অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

একবারের ঘটনা, হযরত আবুল আলীয়া (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে গেলেন। সে সময় তিনি খলীফা হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষ থেকে বসরার দায়িত্ব প্রাপ্ত গর্ভণর ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিলেন। এবং নিজ আসনের ডান পাশে তাকে বসালেন।

মজলিসে তখন কোরাইশের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযি.) এই আচরণে তারা পরস্পরে চোখের দ্বারা ইংগিত করছিল এবং নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করতে লাগল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, দেখলে তোমরা ইবনে আব্বাস কিভাবে এই গোলামকে তার আসনে বসাল ?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাদের ফিসফিস কথা-বার্তা বুঝে ফেললেন, তাই তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ

ইলম সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানকে আরো বাড়িয়ে দেয়, এবং মানুষের মাঝে তার মর্যাদাকে উচুঁ করে এবং এর মত গোলামদেরকে সিংহাসনে বসায়।

*　　*　　*

নবীজীর খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাথে ছিল আবুল আলীয়ার গভীর সম্পর্ক।

একবার হযরত আনাস (রাযি.) তাঁকে একটি আপেল হাদীয়া দিলেন। আবুল আলীয়া তা হাতে নিয়ে তাতে চুমো দিতে দিতে বললেন ঃ

এই আপেলে এমন ব্যক্তির হাতের স্পর্শ লেগেছে যে হাত নবীজীর হাত স্পর্শ করেছিল...

*　　*　　*

এক বৎসর হযরত আবুল আলীয়া (রাযি.) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। তাই জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এবং মুজাহিদদের সাথে বের হবার জন্য রসদ-পত্র ঠিক করলেন।

কিন্তু যাবার দিন সকালে হঠাৎ করে তার এক পায়ে প্রচন্ড ব্যথা করতে লাগল।

তারপর প্রতি মুহূর্তে ব্যথার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল চিকিৎসক এসে পা দেখে বললেন ঃ তিনি “আকালা” রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

হযরত আবুল আলীয়া (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ “আকালা” কি?

চিকিৎসক বললেন ঃ এটা এমন একটা রোগ যা কোন অঙ্গে হলে সে অঙ্গকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ফেলে এবং ধীরে ধীরে সারা গায়ে ছড়িয়ে যায়।

তারপর চিকিৎসক তাঁর পা কেটে ফেলার অনুমতি চাইলেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত আবুল আলীয়া (রহ.) পা কাটার অনুমতি দিলেন।

*　　*　　*

চিকিৎসক গোস্ত ও হাড় কাটার জন্য তার যন্ত্র-পাতি নিয়ে আসলেন।

এরপর হযরত আবুল আলীয়াকে বললেন ঃ আপনি কি চান যে আপনাকে নেশা জাতীয় কোন কিছু খাইয়ে দেই যার ফলে আপনি ব্যথা অনুভব করবেন না ?

হযরত আবুল আলীয়া (রহ.) বললেন ঃ এখানে তো এর চেয়ে উত্তম বস্তু রয়েছে।

চিকিৎসক জিজ্ঞেস করলেন সেটা কি?

হযরত আবুল আলীয়া (রহ.) বললেন ঃ সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে এমন একজন ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো এবং তাঁর জন্য যা সহজ তাকে তাই পড়তে দাও।

অতঃপর যখন তোমরা দেখবে আমার চেহারা রক্তিম হয়ে গেছে আমার চোখের মণি বড় হয়ে গেছে এবং আকাশ পানে আমার দৃষ্টি স্থীর হয়ে গেছে...

তখন তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর...

চিকিৎসক তাই করলেন এবং এভাবেই তার হাড় কাটলেন...

যখন তাঁর হুশ ফিরে এলো ডাক্তার বললেন ঃ মনে হচ্ছে আপনি যেন হাড় কাটার ব্যাথাই অনুভব করেননি।

হযরত আবুল আলীয়া (রহ.) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র ভালবাসার শীতল পরশ আমাকে আত্মসমাহিত করে রেখেছিল...

এবং কুরআনের আয়াতের মিষ্টতা আমাকে বিভোর করে রেখেছিল।

অতঃপর নিজ হাতে তিনি পা ধরলেন এবং সে দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ পরকালে যখন আমি আল্লাহ্‌র সামনে দাড়াঁব এবং তিনি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ গোটা চল্লিশ বছর কি তুমি কোন হারামের দিকে পা বাড়িয়েছ ?

অথবা মুবাহ নয় এমন জিনিস কি স্পর্শ করেছ ?

তখন আমি বলব ঃ না আমি এরূপ করিনি আর আমি যা বলব তাতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী থাকব ইনশাআল্লাহ্

*   *   *

অতঃপর...

হযরত আবুল আলীয়ার তাকওয়া ও খোদাভীতি, পরকালের মুরাকাবা এবং আপন পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এমন অবস্থানে পৌঁছে ছিলেন যে তিনি মৃত্যুর আগে নিজেই নিজের জন্য কাফন তৈরী করে রেখেছিলেন।

তিনি প্রতি মাসে একবার সে কাফন পড়তেন আবার তা খুলে স্বস্থানে রেখে দিতেন...

তিনি সুস্থ সবল থাকাবস্থায়ই সতেরবার ওসীয়ত করেছিলেন...

তিনি তাঁর প্রতিটি ওসীয়তের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতেন, যখন সে নির্ধারিত সময় উপস্থিত হত তখন তিনি সে ওসীয়ত নিয়ে ভাবতেন এবং তা ঠিক করতেন বা কিছু পরিবর্তন করতেন।

অথবা সেটাই বহাল রাখতেন...

তিনি তিরানব্বই হিজরীর শাওয়াল মাসে আপন পালনকর্তার সান্নিধ্যে চলে যান।

দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর পরিচ্ছদ ছিল পবিত্র...

হৃদয় স্বচ্ছ...

আপন পালনকর্তার রহমতের ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী...

এবং নবীজীর সাথে মুলাকাতের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী।

হযরত আহনাফ ইবনে কায়স (রহ.)

আহনাফ ইবনে কায়স মর্যাদা ও নেতৃত্বের এমন উচ্চাসনে
পৌঁছে ছিলেন যে তার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া বা
ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়া তাঁর মর্যদায়
কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না।

-যিয়াদুবনু আবিহী

হযরত আহনাফ ইবনে কায়স (রহ.)

স্বাচ্ছন্দপূর্ণ উজ্জল বসন্তে দামেস্ক নগরী তার ঘন গাছ পালা, সবুজ এবং সুশোভিত বাগান-উদ্যান নিয়ে হাসছিল।

সে সময় আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া ইবনে আবী সফিয়ান (রাযি.)-এর প্রাসাদ তার কাছে আগত প্রতিনিধি দলের স্বাগত জানাতে সর্ব প্রকার প্রস্তুতি নিয়েছিল।

যখন-ই সর্ব প্রথম আগন্তককে খলীফার কাছে আসার অনুমতি দেয়া হল তখনই তার বোন উম্মুল হাকাম বিনতে আবী সুফিয়ান দৌড়ে এলেন এবং খলীফার মজলিসে যে সকল হাদীস বর্ণনা করা হবে তা শোনার জন্য পর্দার আড়ালে বসে পড়লেন।

এবং আমীরুল মুমিনীনের সভাসদবর্গ যে অভিনব ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আকর্ষনীয় কবিতার মাধ্যমে পেশ করবেন এবং যে সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবেন তা শোনার জন্য স্থীর হয়ে বসে গেলেন।

কারণ; তিনি ছিলেন সম্মানিতা, অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এবং সুউচ্চ মনোবলের অধিকারিনী একজন বিদূষী রমণী।

তিনি জানতেন তার ভাই হযরত মুআবিয়া (রাযি.) লোকজনকে তার কাছে আসার অনুমতি দিতেন তাদের মর্যাদা অনুপাতে।

তাই প্রথমেই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রধান্য দিতেন, তারপর বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ, উলামায়ে কেরাম এবং সম্মানিত বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে।

* * *

কিন্তু উম্মুল হাকাম দেখতে পেলেন তার ভাই হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) তাঁর সাথে প্রথম সাক্ষাতকারীকে গুরুত্বহীনভাবে গ্রহণ করলেন। যাতে সামান্য উপেক্ষার ভাব রয়েছে। উম্মুল হাকাম শুনলেন তার ভাই আগন্তককে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ

আল্লাহ্‌র কসম! হে আহনাফ! যখনই আমার সামনে সিফফিন যুদ্ধের চিত্র ফুটে ওঠে এবং আমাদের থেকে সরে গিয়ে হযরত আলীর পাশে তোমার দাড়াঁবার কথা মনে পড়ে তখনই আমার হৃদয়ে ব্যথা জাগে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যাথা থাকবেই।

তখন লোকটি সাথে সাথে বলে উঠল ঃ

আল্লাহ্‌র কসম! হে মুআবিয়া! আমরা যে হৃদয় দিয়ে তোমাকে ঘৃণা করি তা এখনও আমাদের সিনায় বিদ্যমান...

এবং যে তরবারী দিয়ে আমরা তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি তা এখনও আমাদের হাতে রয়েছে...

তুমি যদি যুদ্ধের দিকে এক আংগুল পরিমাণ এগিয়ে যাও তাহলে আমরা যাব দশ আংগুল...

আর যদি তুমি যাও হেঁটে তাহলে আমরা যাব দৌড়ে।

আল্লাহ্‌র কসম! তোমার দানের আশা কিংবা তোমার দুর্ব্যবহারের ভয়ে তোমার কাছে আসিনি।

আমরা তোমার কাছে এসেছি আমাদের পারস্পরিক ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য এবং আমাদের অনৈক্য দূর করে ঐক্যকে সুসংহত ও সদৃঢ় করার জন্য...

তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই চলে গেলেন।

উম্মুল হাকাম এতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকলেও এখন আর পারলেন না। তিনি এই লোকটিকে দেখার জন্য পর্দার এক কোন্ না উঠিয়ে পারলেন না যে অনিষ্ঠতাকে প্রতিহত করছে আরেক অনিষ্ঠতা দ্বারা।

উম্মুল হাকাম দেখতে পেলেন বেঁটে একজন লোক ক্ষীণকায় যার দেহ, ন্যাড়া মাথা দাতগুলো যার পরস্পরে লাগানো। চোখ দুটি কোটরে প্রবেশ করেছে। বাঁকা থুতণী। বাঁকা পা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি। মানুষের মাঝে এমন কোন দোষ নেই যা তার মাঝে নেই।

তখন তিনি তার ভাইয়ের দিকে তাঁকিয়ে বললেন ঃ

হে আমীরুল মুমিনীন! কে এই লোকটি যে স্বয়ং খলীফাকে ধমক দিচ্ছে এবং তাঁর ঘরে বসে তাঁকেই শাসাচ্ছে ?

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তখন বেদনা মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন ঃ এই লোকটি এমন এক ব্যক্তি যখন তিনি রাগ করেন তখন তার সাথে বনী তামীমের একলক্ষ লোকও রাগ করে অথচ তারা জানেও না তিনি কি ব্যাপারে রাগ করেছেন...

তিনি হলেন বনী তামীম গোত্রের সর্দার এবং আরবের অন্যতম বিজয়ী বীর আহনাফ ইবনে কায়স...

তাই এসো আমরা তাঁর জীবন নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করি।

* * *

হিজরতের তিন বছর পূর্বের কথা। কায়েস ইবনে মুআবিয়ার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। লোকে তাকে যাহহাক বলে ডাকত।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই লোকজন তাকে আহনাফ উপাধী দিল। কারণ তার পা দুটি সামান্য বাঁকা ছিল। পরবর্তীতে তার উপনামটাই তার প্রকৃত নামের উপর প্রাধান্য পেয়ে যায়।

তবে আহনাফের পিতা কায়স তার গোত্রের বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি ছিলেন না। আবার একেবারে নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মধ্যম শ্রেণীর একজন মানুষ।

আহনাফ ইবনে কায়স জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নজদের ইয়ামামা অঞ্চলে।

শিশু আহনাফ এতীম অবস্থায় লালিত পালিত হতে থাকেন, কেননা শৈশবে যখন তিনি হাটতেও শিখেননি তখন তাঁর পিতা নিহত হন।

তারপর শৈশবেই যখন তাঁর গোঁফও গজায়নি তখন তাঁর অন্তরে ইসলামের নূর প্রবেশ করে।

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বে আহনাফ ইবনে কায়সের কওমের কাছে একজন দাঈ পাঠান। যিনি

তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকবেন এবং তাদেরকে ইসলামের কালজয়ী আদর্শে আদর্শবান করবেন।

আল্লাহর দ্বীনের এই দাঈ হাজির হলেন তার কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে। তাদের কাছে ইসলামের বাণী পেশ করলেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু লোকজন কোন কথা বলছিল না। চুপ থেকে শুধু একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। আহনাফ ইবনে কায়স সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এগিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ

হে আমার কওম! তোমাদের কি হল কেন তোমরা সংশয় প্রকাশ করছ এবং এক পা এগিয়ে আরেক পা পিছিয়ে যাচ্ছ?

আল্লাহ্র কসম! এই প্রতিনিধি হল কল্যাণের প্রতিনিধি...

নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আদর্শের প্রতি আহবান করছেন এবং তোমাদেরকে নিষেধ করছেন নিকৃষ্টতম মতবাদ থেকে...

আল্লাহ্র কসম! আমরা তো তাঁর কাছ থেকে সুন্দর ও কল্যাণকর কথা ছাড়া অন্য কিছু শুনিনি।

সুতরাং হেদায়াতের প্রতি এই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও। তাহলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

আহনাফ ইবনে কায়সের এই সংক্ষিপ্ত ভাষন তাদেরকে দারুনভাবে প্রভাবিত করল। তাই তাঁরা বিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তারপর সে কওমের নেতৃস্থানীয় একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন।

কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়স তাদের সাথে যেতে পারলেন না। কারণ তিনি বয়সে একেবারেই ছোট ছিলেন।

ফলে তিনি সাহাবী হওয়ার মহান মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হলেন।

কিন্তু সাহাবী হওয়ার সম্মান থেকে বঞ্চিত হলে কি হবে। তিনি নবীজীর সন্তুষ্টি ও দুআ থেকে বঞ্চিত হলেন না...

আহনাফ ইবনে কায়স নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

হযরত উমর (রাযি.)-এর খেলাফতকালে আমি বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করছিলাম। এমন সময় পরিচিত একজন লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হল।

তিনি আমার হাত ধরে বললেন ঃ

আমি কি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিব?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই...

তিনি বললেন ঃ সে দিনের কথা কি আপনার মনে আছে যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপনার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আর আমি তাদেরকে ইসলামের দিকে ডেকেছিলাম এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করার জন্য তাদের কাছে দ্বীন পেশ করেছিলাম আর আপনি যা বলার বলেছিলেন?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমার তা মনে আছে

তিনি বললেন ঃ আমি ফিরে এসে আপনার সে বক্তব্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বলেছিলেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَحْنَفِ হে আল্লাহ তুমি আহনাফ কে ক্ষমা করো।

এ কারণেই আহনাফ বলতেন ঃ কিয়ামতের দিন নবীজীর দুআর চেয়ে আমার অন্য কোন আমলই আশা ব্যঞ্জক নয়

*   *   *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন এবং মুসায়লামা তার মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী নিয়ে আবির্ভূত হল যার ফলে অনেকে মুরতাদ হয়ে গেল। তখন আহনাফ তার চাচা আল মুতাশাম্মাছের সাথে মুসাইলামার কাছে গিয়েছিলেন। তার সাথে সাক্ষাত করে তার কথা শোনার জন্য।

সে সময় আহনাফ ইবনে কায়স যৌবনের প্রারম্ভে অবস্থান করছিলেন। মুসাইলামার সাথে সাক্ষাত করে যখন তিনি বেরিয়ে আসলেন তখন চাচা মুতাশাম্মাছ ভাতিজাকে বললেন ঃ

হে আহনাফ! কেমন মনে হল তোমার লোকটিকে?

আহনাফ বললেন ঃ দেখলাম সে একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তায়ালা এবং মানুষের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে।

তখন তার চাচা উপহাসছলে বললেন ঃ যদি আমি তাকে জানিয়ে দিতাম যে তুমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তাহলে নিজের ব্যাপারে কি তুমি ভয় করতে না ?

আহনাফ বললেন ঃ তখন আমি আপনাকে শপথ করতে বলতাম, তখন আপনি কি শপথ করে বলতে পারতেন যে আপনি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন না ?

তাঁর এই কথায় চাচা ভাতিজা এক সাথে হেসে উঠলেন এবং তাঁরা তাদের ইসলামের উপরই অবিচল রইলেন...

* * *

অল্প বয়স সত্ত্বেও দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তার সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে যদি তোমরা আশ্চর্য হতবুদ্ধি হও তাহলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তোমার এই আশ্চর্য ভাব এবং হত বুদ্ধিতা তখনই দূর হয়ে যাবে যখন তুমি জানতে পারবে যে, এই কিশোরই ছিল তার কওম বনী তামীমের মধ্যে তীক্ষ্ম মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিঁখুত রুচিবোধের ক্ষেত্রে যুগের এক অপূর্ব এবং এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

ছোট বয়স থেকেই তিনি আপন গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে উঠাবসা করতেন, তাদের মসলিসে উপস্থিত হতেন। তাদের সম্মেলনে যোগ দিতেন। এবং তাদের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পন্ডিতদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন।

আহনাফ নিজের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ আমরা "হিলম" তথা সহনশীলতা শিখার জন্য কায়স ইবনে আছেম আল মিনকারীর মজলিসে উপস্থিত হতাম।

তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল তার সহনশীলতা কেমন ছিল ?

তিনি বললেন ঃ একবার আমি তার কাছে গেলাম, তখন তিনি একটি কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘরের আঙ্গিনায় বসেছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের লোকদের সাথে আলোচনা করছিলেন।

আমি তাকে সালাম দিলাম এবং বসে পড়লাম।

ঠিক এমন সময় একটি চিৎকার শুনলাম এবং তখনই দেখলাম তার কাছে এক যুবককে নিয়ে আসা হল। সাথে আরেকটি যুবকের নামও আনা হল। তখন তাকে বলা হল ঃ

এ হল আপনার ভাতিজা সে আপনার অমুক সন্তানকে হত্যা করেছে এই আপনার ছেলের মৃতদেহ।

কিন্তু কি অবাক ব্যাপার আপন নিহত ছেলের মৃতদেহ দেখা সত্ত্বেও তার গায়ের কাপড় পড়ল না এবং তিনি কথাও বন্ধ করলেন না।

কথা শেষ করে আপন ভাতিজার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

হে আমার ভাতিজা! তুমি তোমার চাচার পুত্রকে হত্যা করেছ এবং তুমি নিজ হাতে তোমার রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছ।

এবং নিজের তীরেই নিজেকে আক্রমণ করেছ...

তারপর তিনি তার আরেক পুত্রকে বললেন ঃ

যাও বেটা তোমার ভাইয়ের বাধন খুলে দাও এবং তোমার মৃত ভাইকে ঢেকে দাও।

এবং তার মাকে রক্ত পণ হিসাবে একশত উট দিয়ে দাও কারণ সে অসহায়।

* * *

বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য আহনাফের হয়েছে যাদের শীর্ষে রয়েছেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)

তাঁর মজলিসগুলোতে তিনি উপস্থিত থাকতেন। তাঁর বক্তব্য শুনতেন তাঁর বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করে হৃদয়পটে তা গেঁথে নিতেন। যে সকল

শাগরিদের দ্বারা হযরত উমরের মাদরাসা উজ্জল হয়েছে হযরত আহনাফ ছিলেন তাদের অন্যতম, এবং তিনি তাঁর অনন্য মহান শিক্ষকের ইলমের দ্বারা বেশী প্রভাবিত ছিলেন।

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ আপনি কি করে এই গাম্ভীর্য এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হলেন ?

জবাবে তিনি বললেন ঃ কিছু কথার দ্বারা যা আমি হযরত উমর (রাযি.) এর কাছ থেকে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

যে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে মানুষ তাকে হালকা মনে করে...

আর যে কোন কাজ বেশী করে সে ঐ কাজেই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়...

আর যে বেশী কথা বলে তার স্খলনও বেশী হয়...

আর যার স্খলন বেশী হয় তার লজ্জাও কমে যায়...

আর লজ্জা যার কমে যায় তার তাকওয়াও হ্রাস পায়...

আর তাকওয়া যার কমে যায় তার হৃদয় মরে যায়...

* * *

আহনাফ ইবনে কায়স আপন গোত্রের নেতা হিসাবে বরিত হলেন অথচ বংশগতদিক থেকে তিনি তাদের শীর্ষে ছিলেন না...

এবং পিতা-মাতার দিক থেকেও তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন না।

একারণেই এর রহস্য সম্পর্কে কোন কোন মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করত। তাদের জনৈক ব্যক্তি এভাবে প্রশ্ন করল ঃ

হে আবু বাহর! কাকে তার গোত্র নেতা হিসাবে বরণ করে ?

তিনি বললেন ঃ যার মধ্যে চারটি গুণ থাকে। সে বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় আপন গোত্রের নেতা নির্বাচিত হয়।

তাকে জিজ্ঞেস করা হল সে চারটি কি ?

তিনি বললেন ঃ যে এমন দ্বীনের অনুসারী যা খারাপ কাজ থেকে তাকে বাধা প্রদান করে...

এবং যার এমন বংশ মর্যাদা রয়েছে যা তাকে যাবতীয় অশালীন কাজ থেকে রক্ষা করে...

এবং যার এমন আকল ও বিবেক রয়েছে যা তাকে সঠিক পথ দেখায়...

এবং যার এমন লজ্জা রয়েছে যা তাকে অশ্লীলতা থেকে বাধা প্রদান করে...

* * *

উপরন্তু আহনাফ ইবনে কায়স ছিলেন আরবের সে সকল সহনশীলদের একজন যাদের সহনশীলতাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা হয়ে থাকে।

তার সহনশীলতার নানা কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

যেমন একবার জনৈক ব্যক্তি আহনাফ ইবনে কায়সকে অশ্লীল গালি দিয়ে উত্তেজিত করতে চাইল।

কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়স মাথা নীচু করে চুপ রইলেন, কোন কথাই বললেন না। লোকটি যখন দেখল তিনি কোনরূপ প্রতিউত্তর করছেন না এবং তার কথার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করছেন না। তখন সে রাগে বৃদ্ধাঙ্গলী কামড়াতে কামড়াতে বলল ঃ

হায় আফসোস! আল্লাহ্‌র কসম তার কাছে আমার নীচুতা এবং তুচ্ছতাই তাকে জবাব দিতে বারণ করেছে

* * *

একবার আহনাফ ইবনে কায়স বসরার উপকণ্ঠে একাকী হাঁটছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তার পিছু নিয়ে তাকে গালি দিতে লাগল এবং তাকে দুঃখ জনক কটু কথা শোনাতে লাগল। কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়স একেবারে নীরব রইলেন এবং আপন মনে হাটতে লাগলেন।

যখন তারা দু'জনেই লোকজনের কাছাকাছি চলে আসলেন তখন আহনাফ অন্য লোকটির দিকে তাঁকিয়ে বললেন ঃ হে আমার ভাতিজা! যদি আর কিছু বলার বাকী থাকে তাহলে তা এখনই বলে ফেল। কারণ তুমি যা বলছ তা যদি আমার কওম শুনতে পায় তাহলে তারা তোমাকে আস্ত রাখবে না।

এছাড়াও আহনাফ ইবনে কায়স ছিলেন একজন ইবাদতগুজার মানুষ। দিনের বেলায় রোযা রাখতেন রাতের বেলা নামায আদায়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর মানুষের হাতে যা আছে তার প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্মোহ।

রাত হওয়ার সাথে সাথে বাতি জালাতেন এবং নিজের কাছে রেখে নামাযে দাড়িয়ে যেতেন এবং রুগ্ন ব্যক্তির মত কাঁপতেন এবং আল্লাহ্‌র আযাবের ভয়ে সন্তান হারা পিতার মত কাঁদতেন এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধের আশংকায় রোনাযারী করতেন...

যখনই তিনি নিজের কোন গোনাহ আঁচ করতে পারতেন অথবা নিজের কোন দোষ ক্রটি সম্পর্কে অবগত হতেন তখন প্রদীপের আগুনের কাছে আংগুল নিয়ে বলতেন ঃ

হে আহনাফ! এখন বুঝ এই আগুনের মজা!!

কেন তুমি অমুক দিন অমুক কাজ করলে?

ছি... আজ যখন তুমি এই সামান্য প্রদীপের আগুন সহ্য করতে পারছ না এবং তার তাপ সহ্য করতে পারছ না তাহলে কাল কিভাবে জাহান্নামের আগুন সহ্য করবে এবং কিভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে ?

হে আল্লাহ্ তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে তো তুমিই এর উপযুক্ত। আর যদি আমাকে শাস্তি দাও তাহলে আমিই তার উপযুক্ত।

* * *

আল্লাহ তায়ালা আহনাফ ইবনে কায়সের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন যুগের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব...

এবং এক দৃষ্টান্তহীন মানব...

আহনাফ ইবনে কায়স

দ্বিতীয় পর্ব

আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় এই যুবক
বসরাবাসীর নেতা।

–উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)

আহনাফ ইবনে কায়স

দ্বিতীয় পর্ব

আমরা এখন উমর ইবনে খাত্তাবের খেলাফত কালের শুরুর দিকে।

ঐতো আহনাফ ইবনে কায়সের গোত্রের সম্মানিত লোকজন। যারা সর্ব বিষয়ে পারদর্শী যারা দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে আরোহন করছে।

সাথে ঝুলিয়ে নিচ্ছে অনেক দিন ধরে ধারানো তরবারী।

তারা সমতল ও উচুভূমি মাড়িয়ে বসরার উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ী ত্যাগ করছে।

তাদের উদ্দেশ্য, তারা উৎবা ইবনে গাযওয়ানের নেতৃত্বে পরিচালিত মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মিলিত হবে, যারা পারেস্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে প্রস্তুত হয়েছে...

আল্লাহ্ রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে...

এবং আল্লাহ্র কাছ থেকে উত্তম বিনিময়ের প্রত্যাশায়...

আর তাদের সাথে রয়েছেন যুবক আহনাফ ইবনে কায়স।

* * *

একদিনের ঘটনা। উৎবা ইবনে গাযওয়ান আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে একটি পত্র পেলেন। খলীফা সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে নীতিবান ও ন্যায়নিষ্ঠ এমন দশজন মুজাহিদ পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। কারণ খলীফা তাদের কাছ থেকে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অবস্থা জানবেন এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনাও পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

উৎবা ইবনে গাযওয়ান সেনাবাহিনীর মধ্যে খলীফার এ নির্দেশ প্রচার করে দিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট দশজনকে নির্বাচন করলেন।

আহনাফ ইবনে কায়স ছিলেন সে দশজনের একজন।

অবিলম্বে তাদেরকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করে দিলেন।

* * *

প্রতিনিধি দলটি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের সামনে উপস্থিত হলেন। আমীরুল মুমিনীন তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং তাদেরকে নিকটে বসালেন। তারপর তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

তখন তারা একের পর এক বলতে লাগল ঃ

আপনি তো সাধারণ মানুষের অভিভাবক এবং তাদের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বশীল।

কিন্তু আমরা শুধু আমাদের প্রয়োজনের কথাই বলব।

তারপর প্রত্যেকেই খলীফার কাছে তাদের প্রয়োজনের কথা পেশ করলেন।

প্রতিনিধি দলের মধ্যে আহনাফ ইবনে কায়সই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাই সবার শেষে তিনি খলীফার সাথে কথা বললেন ঃ

তিনি প্রথমেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন ঃ

হে আমীরুল মুমিনীন! যে মুসলিম বাহিনী মিসরে অবস্থান করছে তারাতো সবুজ-শ্যামল এবং ফিরআউনদের প্রাচুর্যপূর্ণ ঘরবাড়ীতে বসবাস করছে ।

আর যারা শামে অবতরণ করছে তারা কায়সারদের সুখ-স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ঘর-বাড়ী এবং ফল ফলাদীপূর্ণ বাগ-বাগিচায় বসবাস করছে।

আর যারা পারস্যে অবতরণ করছে তারাতো সুমিষ্ট পানির নহরের তীরে এবং কিসরার রাজপ্রসাদের সবুজ-শ্যামল উদ্যানে অবস্থান করছে।

কিন্তু আমাদের কওম। যারা বসরায় এসেছে তারা এমন নরম এবং লবনাক্ত অনুর্বর ভূমিতে অবতরণ করেছে যার মাটি কখনও শুকায় না এবং যাতে কোন উদ্ভিদ গজায়না।

তার একপাশে রয়েছে লবনাক্ত সাগর আর অপরপাশে হল দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি।

সূতরাং হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করে দিন এবং তাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যপূর্ণ করে তুলুন।

আর আপনি বসরার গভর্ণরকে এ মর্মে নির্দেশ দিন তিনি যেন একটি নহর খনন করে দেন। যাতে বসরাবাসী তা থেকে সুমিষ্ট পানি পান করতে পারে এবং তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে পান করাতে পারে এবং ফসলের খেত আবাদ করতে পারে।

ফলে তাদের অবস্থা উন্নত হবে তাদের পরিবার পরিজন সাবলম্বী হবে এবং তাদের দ্রব্য মূল্য হ্রাস পাবে।

এর ফলে তারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে বেশী বেশী সাহায্য করতে পারবে।

এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হলে হযরত উমর (রাযি.) বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন এবং প্রতিনিধিদলকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

সে যা বলল, তোমরা কেন তা বললেন না ?

আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় সে আপন গোত্রের নেতা হবার উপযুক্ত।

তারপর খলীফা তাদেরকে পুরষ্কার দিলেন।

যখন আহনাফ ইবনে কায়সের দিকে পুরস্কার বাড়িয়ে ধরলেন তখন তিনি বললেন ঃ

আল্লাহ্র কসম! হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা পুরষ্কার লাভের আশায় সকাল সন্ধা উটের পিঠে চড়ে এই বিয়াবন মরুভূমি সফর করি নাই।

আপনার কাছে আমার ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন নেই, আমার কওমের, প্রয়োজন পূরনার্থেই শুধু আপনার কাছে এসেছি।

যদি আপনি তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন তাহলে এতেই যথেষ্ট হবে এবং আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে...

এবার হযরত উমর (রাযি.) এর বিমুগ্ধতা আর ও বেড়ে গেল তিনি বলে উঠলেন ঃ নিশ্চয় এই যুবক বসরাবাসীর সর্দার।

যখন মসলিস শেষ হল এবং প্রতিনিধি দল রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তাদের তাবুর কাছে যেতে উদ্যত হল তখন হযরত উমর (রাযি.) তাদের ব্যাগগুলোর প্রতি দৃষ্টি ফিরালেন। তিনি দেখতে পেলেন একটি ব্যাগ থেকে

কাপড়ের একটি কোন বের হয়ে আছে। তা দেখে তিনি সেদিকে গেলেন এবং নিজ হাতে কাপড়ের কোনাটি ধরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

এটা কার ?

আহনাফ ইবনে কায়স বললেন ঃ এটা আমার হে আমীরুল মুমিনীন !

আহনাফ বুঝতে পারলেন যে হযরত উমর (রাযি.) কাপড়টিকে খুব দামী মনে করছেন।

হযরত উমর (রাযি.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন কত দিয়ে এটা কিনেছ ?

আহনাফ বললেন ঃ আট দিরহাম দিয়ে।

অথচ তিনি নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত জানেন যে এই মিথ্যা কথাটা ছাড়া জীবনে কখনও আর মিথ্যা তিনি বলেন নি।

কারণ; কাপড়টি তিনি কিনেছেন বার দিরহাম দিয়ে।

তখন হযরত উমর (রাযি.) অত্যন্ত কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

কেন এক দিরহাম দিয়ে কিনলেই তো যথেষ্ট ছিল আর বাকী অংশ কোন মুসলমানকে সাহায্য করার জন্য কোথাও রেখে দিতে।

তারপর হযরত উমর (রাযি.) বললেন ঃ

তোমরা এতটুকু পরিমাণ সম্পদ ব্যয় কর, যাতে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ হয়...

আর অতিরিক্ত অংশ কোথাও রেখে দিবে যার দ্বারা নিজেরা শান্তি পাবে এবং লাভবান হবে...

তখন আহনাফ লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেললেন কোন কথা বললেন না।

*   *   *

প্রতিনিধি দলকে বসরায় ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করলেন হযরত উমর (রাযি.) কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়সকে তাদের সাথে যাবার অনুমতি দিলেন না। খলীফা পূর্ণ এক বৎসর তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

কেননা তিনি তার দূরদর্শীতা এবং অপরিমিত অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন...

এই তামিমী কিশোরের মেধার...

তার অসাধারণ বর্ণনাশক্তির...

তার সুউচ্চ মানসিকতার...

সুউচ্চ মনোবলের...

এবং সম্পদের প্রতি তার নির্মোহতার...

তাই নিজ দায়িত্বে গড়ে তোলার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

যাতে তিনি বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের সংস্পর্শে থেকে তাদের হেদায়েতে চলতে পারেন...

এবং তাদের নিকট হতেই দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারেন...

তাছাড়া তিনি কাছ থেকে তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন তিনি। এবং তাকে গভর্ণর বানাবার আগেই তার অন্তরে মুসলমানদের কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছেন।

কারণ শাসকগণ যখন ভাল হয়ে যায় দুনিয়াকে তখন কল্যাণে ভরে দেয়...

আর যখন খারাপ হয়ে যায় তখন তাদের মেধা ও যোগ্যতা হয়ে যায় মানুষের জন্য মহা বিপদ...

একবৎসর পূর্ণ হলে হযরত উমর (রাযি.) আহনাফকে বললেন ঃ

হে আহনাফ! আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছি এবং তোমাকে যাচাই করেছি। আমি তোমার মধ্যে কল্যাণ ব্যতীত কিছু দেখি নাই।

তোমার বাহ্যিক পোশাক পরিচ্ছদ দেখেছি সুন্দর আর আমার বিশ্বাস, তোমার ভেতরও হবে তোমার বাহিরের মত স্বচ্ছ সুন্দর ও নির্মল।

তারপর তাকে পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং সেনাপতি আবু মুসা আশআরীর কাছে একটি চিঠি লিখে দিলেন।

চিঠির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

"হামদ ও সালাতের পর; তুমি আহনাফ ইবনে কায়সকে তোমার কাছে রাখবে এবং তার সাথে পরামর্শ করবে এবং তার কথা গভীর মনযোগ দিয়ে শুনবে।"

* * *

আহ্নাফ ইবনে কায়স মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন যে বাহিনী পারস্যের পূর্ব পশ্চিমে আক্রমণ করছিল।

তিনি ও তার গোত্র বনী তামীম শত্রুর মোকাবিলায় শক্তি ও দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন এবং শত্রুর মোকাবিলায় তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের হাতে কিসরার শাহী মুকুটের মুক্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ তুসতর শহর বিজিত হল এবং তাদের হাতেই হুরমুযান বন্দী হলো।

* * *

পারস্য সেনানায়কদের মধ্যে হুরমুযান ছিল অত্যন্ত দূর্ধর্ষ অসম্ভব ধূর্ত।

এবং তাদের মধ্যে ছিল সবচে দাম্ভিক, যুদ্ধের মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণায় ছিল সিদ্ধহস্ত এবং প্রতিজ্ঞা ও মনোবলে ছিল অত্যন্ত দৃঢ়।

মুসলমানদের অব্যাহত বিজয় এবং অপ্রতিহত অগ্রযাত্রা বারবার তাকে সন্ধি করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সুযোগ পেলেই সে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং তার ধারণা ছিল যে সে জয় লাভে সক্ষম হবে।

মুসলিম বাহিনী তাকে তুসতর শহরে অবরোধ করলে সে শহরের একটি সুরক্ষিত দূর্গে আশ্রয় নিল এবং মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

আমার সাথে রয়েছে একশটি তীর

আল্লাহর কসম! আমার হাতে একটি তীরও থাকা পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। আর তোমরা তো একথা ভাল করেই জান যে আমার নিক্ষিপ্ত তীর একেবারে অব্যর্থ। কখনও ভুল করে না।

কাজেই তোমাদের একশত লোককে জখমী বা নিহত করার পর আমাকে বন্দী করে তোমাদের কোন লাভ হবে না।

মুসলিম বাহিনী তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি চাও ?

হূরমুযান বলল ঃ আমি চাই তোমাদের খলীফা উমরের ফয়সালার ভিত্তিতে নেমে আসতে। এরপর তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন।

মুসলিম বাহিনী বলল ঃ ঠিক আছে তোমাকে সে সুযোগ দেয়া হল।

তখন হুরমযান তার ধনুক মাটিতে ফেলে দিল এবং আত্মসমর্পণ করে নেমে আসল। সাথে সাথে মুজাহিদগণ শক্ত করে তাকে বেঁধে ফেললেন এবং একদল দুধর্ষ মুজাহিদের সাথে তাকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হল।

যাদের শীর্ষে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) এবং উমর (রাযি.)-এর একান্ত শাগরিদ আহনাফ ইবনে কায়স।

* * *

প্রতিনিধি দলটি বন্দী হূরমযানকে নিয়ে বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন।

সাথে নিয়ছেন বাইতুল মালের জন্য এক পঞ্চমাংশ গণীমতের মাল।

তারা ধোঁকাবাজ প্রতারক হূরমযানকে খলীফার হাতে সোর্পদ করবেন। এরপর তিনি যা ইচ্ছা তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

তারা মদীনার উপকণ্ঠে পৌছলে হূরমযানকে তার নিজস্ব পোশাকে মুসলমানদের সামনে উপস্থিত করার জন্য প্রস্তুত করল।

তাই তাকে স্বর্ণখচিত মূল্যবান রেশমের কাপড় পড়াল এবং মনি মুক্তা খচিত শাহী মুকুট তার মাথায় পড়িয়ে দিল।

এবং খাঁটি স্বর্ণ ও মণি মুক্তা শোভিত লাঠি তার হাতে ঝুলিয়ে দিল। এরপর চলতে লাগল মদীনার উদ্দেশ্যে।

তারা মদীনায় পা রাখার সাথে সাথেই যুবক বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর সকলেই তাদের চারপাশে জড়ো হতে লাগল...

তারা অবাক বিস্ময়ে তাদের বন্দীকে দেখছিল এবং তার অবস্থা ও পোশাক পরিচ্ছদ দেখে বিস্ময়াভিভূত হচ্ছিল।

* * *

প্রতিনিধি দলটি তাদের বন্দী হূরমযানকে নিয়ে সোজা খলীফা উমরের গৃহাভিমূখে চলতে লাগল। কিন্তু হযরত উমর (রাযি.) গৃহে ছিলেন না।

তাই তারা লোকজনকে খলীফা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন তাদেরকে বলা হল ঃ একটি প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে মসজিদে গিয়েছেন।

তাই তারাও মসজিদের দিকে চললেন কিন্তু সেখানেও তাঁকে পাওয়া গেল না।

খলীফার সন্ধান পেতে যতই তাদের বিলম্ব হচ্ছিল লোকজনের উপস্থিতি ততই বেড়ে চলছিল।

তাদেরকে এই পেরেশানী অবস্থায় দেখে খেলাধুলায় রত একদল শিশু জিজ্ঞেস করল।

কি হয়েছে আপনাদের একবার এদিকে আসছেন আবার ওদিকে যাচ্ছেন। ব্যাপার কি ? আপনারা কি আমীরুল মুমিনীনকে খুজঁছেন ?

তারা বলল ঃ হ্যা আমরা তাকেই খুঁজছি।

শিশুরা বলল ঃ তিনি তো চাদর মাথায় দিয়ে মসজিদের ডান পাশে ঘুমুচ্ছেন

কুফা থেকে আগত একটি প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানোর জন্য বুরনুস পড়ে তিনি বাহিরে এসেছিলেন।

এরপর প্রতিনিধি দল চলে গেলে বুরনুস খোলে মাথার নীচে রেখে ঘুমের কোলে নিজকে সপেঁ দিয়েছেন।

তাই পারস্য থেকে আগত এই প্রতিনিধিদলটি মসজিদের ডান পাশে গেল। এবং তাঁকে ঘুমুতে দেখে তার কাছেই বসে পড়ল...

তাদের বন্দীকেও তাদের সাথে বসাল...

* * *

হুরমুযান আরবী কিছুই বুঝত না।

এবং সে কল্পনাও করতে পারেনি যে মসজিদের একপাশে ঘুমন্ত এই ব্যক্তিটিই স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)।

অবশ্য দুনিয়ার প্রতি হযরত উমর (রাযি.) এর নির্মোহতা এবং পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও সৌন্দর্যের প্রতি তার নিরাশক্তির কথা হুরমুযান আগেই শুনেছিল।

কিন্তু সে কল্পনাও করতে পারেনি যে রোম ও পারস্য বিজেতা মসজিদের একপাশে ঘুমুতে পারেন।

অথচ সেখানে কোন পর্দা নেই...

হেলান দেয়ারও কিছু নেই...

নেই কোন পাহারাদার...

আর না আছে কোন দারোয়ান...

লোকজনকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে হুরমুযান মনে মনে ভাবল, হয়ত তারা নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এবং খলীফার আগমনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু আহনাফ ইবনে কায়স ইংগিতে লোকজনকে বলে দিলেন, তারা যেন কোন কথা না বলে এবং কোনরূপ শোরগোল না করে কেননা তাতে খলীফা জেগে উঠতে পারেন।

কারণ আহনাফ ইবনে কায়স হযরত উমরের সোহবতে থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, খলীফা রাতে খুব কম সময়-ই ঘুমান।

রাতের আধারে হয় তিনি মসজিদে নামায পড়েন...

অথবা সাধারণ মানুষের অবস্থা জানার জন্য মদীনার অলীতে-গলিতে ঘুরে বেড়ান...

অথবা দুষ্কৃতিকারীদের থেকে মুসলমানদের ঘরবাড়ী রক্ষার জন্য পাহারায় রত থাকেন...

লোকদের প্রতি আহনাফ ইবনে কায়সের ইংগিতে হুরমুযান সতর্ক হয়ে উঠল এবং মুগীরা ইবনে শোবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ

এই ঘুমন্ত ব্যক্তিটি কে?

হযরত মুগীরা (রাযি.) যেহেতু ফারসী ভাষা জানতেন তাই ফারসীতেই তাকে বললেন; ইনিইতো আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযি.)।

হযরত মুগীরার কথা শুনে হুরমুযান একেবারে হতবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ের সাথে বলে উঠল; উমর!!!

কোথায় তার পাহারাদার কোথায় তার দারোয়ান? মুগীরা (রাযি.) তাকে বললেন ঃ তাঁর কোন পাহারাদারও নেই, কোন দারোয়ানও নেই।

হুরমুযান বলল ঃ এমন ব্যক্তি তো একমাত্র নবীই হতে পারেন।

মুগীরা (রাযি.) বললেন; না তিনি নবী নন, বরং তিনি নবীর কাজ করেন, কেননা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোন নবী আসবে না...

এদিকে ধীরে ধীরে মানুষের ভীড় বেড়ে গেল এবং মানুষের শোরগোলও বৃদ্ধি পেল। ফলে হযরত উমর (রাযি.) জেগে উঠলেন এবং সোজা হয়ে বসলেন।

দৃষ্টি ফেরাতেই তিনি দেখতে পেলেন পারস্যের শাসক হুরমুযান, যার মাথায় শোভা পাচ্ছিল শাহী মুকুট, সূর্যের আলোতে যা চকচক করছিল...

আর তার হাতে ছিল লাঠি, তার ঔজ্জ্বল্য যেন দৃষ্টিকে কেড়ে নিচ্ছিল।

হযরত উমর (রাযি.) তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার ছড়িটির দিকে তাকালেন এবং বললেন, হুরমুযান?!!

আহনাফ ইবনে কায়স তখন বললেন, হ্যা আমীরুল মুমিনীন! এ-ই হুরমুযান।

তখন হযরত উমর (রাযি.) তার গায়ে স্বর্ণ, মনি-মুক্তা এবং রেশমের বাহারী কাপড় দেখে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন।

তারপর তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন; আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই...

এবং দুনিয়ার ব্যাপারে তার-ই সাহায্য চাই...

প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি এই লোকটিকে এবং তার বাহিনীকে পরাজিত করেছেন...

অতঃপর বললেন...

হে মুসলমানগণ! তোমরা এই দ্বীনকে আকড়ে ধর...

এবং তোমাদের নবীর হেদায়েতের উপর-ই চল...

এবং তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন দুনিয়া তোমাদের উপর চেপে না বসে। কেননা; দুনিয়া হল প্রতারক...

হযরত উমর (রাযি.) তার কথা শেষ করলে আহনাফ ইবনে কায়স তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন।

এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিপুল গণীমতের মাল দান করেছেন।

এবং আরো বললেন;

হে আমীরুল মুমিনীন! হুরমুযান আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং আপনার ফয়সালায় দূর্গ থেকে নেমে এসেছে। সে আপনার সামনে উপস্থিত, ইচ্ছা হলে তার সাথে কথা বলতে পারেন।

হযরত উমর (রাযি.) বললেন; যতক্ষণ তোমরা তার গা থেকে অহংকার ও দাম্ভিকতার পোশাক না খুলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার সাথে কোন কথা বলবো না।

তখন মুসলমানগণ তার মাথা থেকে শাহী মুকুট নামিয়ে ফেলল, তার হাত থেকে লাঠি নিয়ে নিল এবং সতর ঢাকার জন্য তাকে মোটা কাপড় পড়াল।

তারপর হযরত উমর (রাযি.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ

বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কেমন পেলে হুরমুযান ?

লাঞ্ছনা ও অপমানে হুরমুযান মাথা নীচু করে ফেলল এবং বলল ঃ

হে উমর! ইতিপূর্বে আমরা যেমন ছিলাম তোমরাও তেমন ছিলে। আমরা যেমন মূর্খতা ও বর্বরতার অন্ধকারে ডুবে ছিলাম তোমরাও কোন অংশে আমাদের চেয়ে কম ছিলে না। তখন আমাদের সাথে যেমন আল্লাহ ছিলেন না ঠিক তোমাদের সাথেও ছিলেন না। ফলে আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ করেছি...

কিন্তু যখন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলে তখন আল্লাহ্ তোমাদের সাথে হয়ে গেলেন তখন তোমরা আমাদের উপর জয়লাভ করলে আর আমার পরাজিত হলাম...

তখন হযরত উমর (রাযি.) তাকে বললেন; সে সময় আমাদের উপর তোমাদের বিজয়ের যে কারণটি তুমি উল্লেখ করেছ তা যথার্থ। তবে আর একটি কারণও আছে। তাহল তোমাদের ঐক্য এবং আমাদের অনৈক্য...

অতপর হযরত উমর (রাযি.) অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ

তুমি কেন একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে। কি তোমার উযর এই বিশ্বাসঘাতকতার ?

হুরমুযান তখন বললেন ঃ

আমার ভয় হচ্ছে আমাকে আপনি হত্যা করবেন।

হযরত উমর (রাযি.) বললেন ঃ আমার প্রশ্নের জবাব দেয়া পর্যন্ত তুমি নিরাপদ।

হযরত উমর (রাযি.)-এর মুখে এই নিরাপত্তার কথা শুনে তার ভয় ও শংকা অনেকটা কমে গেল।

তখন সে বলল ঃ আমি পিপাসার্ত, হযরত উমর (রাযি.) তখন তাকে পানি পান করাবার নির্দেশ দিলেন।

তখন একটি মোটা পাত্রে পানি আনা হল।

পাত্রটি দেখে সে একটু চিন্তা করল এবং বলল ঃ

আমি যদি পিপাসায় মরেও যাই তবুও এমন পাত্রে পানি পান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তখন হযরত উমর (রাযি.)-এর নির্দেশে তার পছন্দমত পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি নেয়ার সময় তার হাত কাঁপছিল।

হযরত উমর (রাযি.) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার, কি হল তোমার ?

হুরমুযান বলল ঃ আমার আশংকা হচ্ছে এই পানি পান করা অবস্থায় আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলবেন।

তখন হযরত উমর (রাযি.) বললেন ঃ এই পানি পান করা পর্যন্ত তুমি নিরাপদ।

সে সাথে সাথেই পানিসহ পাত্রটি ফেলে দিল।

হযরত উমর (রাযি.) বললেন ঃ তার জন্য আবার পানি নিয়ে এসো। পিপাসার্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করো না।

হুরমুযান তখন বলল ঃ আমার পানির কোন প্রয়োজন নেই।

আমি আমার নিজের ব্যাপারে নিরাপত্তার জন্যই পানি পান করার এই বাহানা করেছি।

হযরত উমর (রাযি.) তখন বললেন; আমি তোমাকে হত্যা করব।

হুরমুযান বলল; আপনি তো আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

হযরত উমর (রাযি.) বললেন; তুমি মিথ্যা বলেছ।

তখন আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বললেন; আমীরুল মুমিনীন সে সত্য বলেছে। আপনি তাকে জানের নিরাপত্তা দিয়েছেন।

হযরত উমর (রাযি.) বললেন; ছি...তুমি একি বলছ আনাস? আমি কি তোমার ভাই বারা ইবনে মালিক এবং মাজযাআ ইবনে সাত্তর-এর হত্যাকারীকে নিরাপত্তা দিব?

অসম্ভব...

তখন আনাস (রাযি.) বললেন; আপনি তো বলেছেন; আমাকে জানানো পর্যন্ত তোমার কোন অসুবিধা নেই এবং এও বলেছেন; পানি পান না করা পর্যন্ত তুমি নিরাপদ।

আহনাফ ইবনে কায়সও হযরত আনাস (রাযি.) এর কথা সমর্থন করলেন এবং উপস্থিত লোকজনও সমর্থন করল।

হযরত উমর (রাযি.) তখন তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন।

তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আল্লাহর কসম আমি একজন মুসলমানের কারণেই প্রতারিত হলাম।

হযরত উমর (রাযি.) এর ঔদার্যে হুরমুযান বিস্মিত হল এবং সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করল। আর হযরত উমর (রাযি.) তাকে দুই হাজার দিরহাম দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

* * *

মুসলমানদের সাথে পারস্যবাসীর বারবার বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ হযরত উমর (রাযি.) কে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল।

তাই তিনি হুরমুযানের সাথে আগত প্রতিনিধিদলকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন;

মুসলমানরা কি যিম্মীদেরকে কষ্ট দেয়? তাদের সাথে কি দুর্ব্যবহার করে যার ফলে তারা বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে ?

তখন প্রতিনিধি দল বলল; আল্লাহর কসম আমাদের জানা নেই যে কেউ তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে।

অথবা তাদের সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন...

অথবা তাদের সাথে কৃত চুক্তির পরিপন্থি কোন কিছু করেছে...

তখন হযরত উমর (রাযি.) বললেন; তাহলে তোমাদের এবং তাদের মধ্যে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন তারা সুযোগ পেলেই উল্টে বসে? এবং তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে?

তখন প্রতিনিধি দল যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে হযরত উমর (রাযি.) আশ্বস্ত হতে পারলেন না।

তখন আহনাফ ইবনে কায়স দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন;

আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিব, হে আমীরুল মুমিনীন!

হযরত উমর (রাযি.) বললেন;

বল! তুমি কি বলবে?

আহনাফ ইবনে কায়স্ বলতে শুরু করলেন ঃ

হে আমীরুল মুমিনীন! পারস্যের ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে অভিযান চালাতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং তাদের যে অঞ্চলগুলি আমরা দখল করেছি তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আর পারস্যবাসী এমন এক জাতি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের একজন বাদশাহ যিন্দা থাকবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন একটা অঞ্চল তাদের অধিনে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের জাতি ভাইকে মুক্ত করার জন্য এবং ছুটে যাওয়া অঞ্চলগুলোকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য একের পর এক যুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবে।

আর যারা আমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ তাদেরকে যখনই কেউ ডাকবে এবং যখনই তারা কোন সুযোগ পাবে তখনই তারা তাদের সাথে মিলিত হবে।

আর হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি মনে রাখবেন, একই রাজ্যে দুজন শাসক থাকতে পারে না।

অতএব কোন সন্দেহ নেই যে, একজন আরেকজনকে অপসারণ করার আপ্রাণ চেস্টা করবে।

কাজেই আপনি যদি আমাদেরকে তাদের অন্যান্য অঞ্চলেও অভিযান চালাবার অনুমতি দেন তাহলে আমরা তাদের বাদশাহদের উপর আক্রমন করব এবং তাদের রাজ্য কেড়ে নিব। তাহলে তাদের আশা ধুলিস্যাত হয়ে যাবে। তাদের আন্দোলন থেমে যাবে। এবং সকল ব্যাপারটাই আমাদের অনুকূলে চলে আসবে।

আহনাফ ইবনে কায়সের বক্তব্য শেষ হলে হযরত উমর (রাযি.) কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে রইলেন এরপর বললেন;

নিশ্চয় আহনাফ ইবনে কায়স সত্য বলেছে এবং পারস্যবাসী সম্পর্কে যা জানতাম না তা আজ জানতে পারলাম।

* * *

এই ছিল আনহাফ ইবনে কায়সের পূর্বাপর অবস্থা...

আর তার এই পরামর্শে পাল্টে গিয়েছিল ইতিহাসের গতিধারা।

আল্লাহ তাকে জান্নাতে সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

হযরত আবু হানীফা আন-নোমান (রহ.)
প্রথম পর্ব

আমি আবু হানীফার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান
ও শ্রেষ্ঠ মুত্তাকী কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।

–ইয়াযিদ ইবনে হারুন

হযরত আবু হানীফা আন-নোমান (রহ.)
প্রথম পর্ব

তিনি ছিলেন সুন্দর চেহারার অধিকারী উজ্জল আকৃতি বিশিষ্ট। ছিলেন সুমিষ্ট উচ্চারণ ও সমধুর ভাষণের অধিকারী।

তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না আবার এমন বেঁটেও ছিলেন না যার থেকে মানুষ চোখ ফিরিয়ে নেয়।

তিনি আকর্ষণীয় পোশাক পড়তেন। অধিক আতর ব্যবহার করতেন। যখন তিনি মানুষের মাঝে বের হতেন তখন তাকে না দেখেই তার আতরের ঘ্রাণেই তার আগমণ বার্তা মানুষ বুঝে নিত।

তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন নোমান ইবনে ছাবেত আল মারযুবান, যার উপনাম আবু হানীফা। যিনি সর্বপ্রথম ফিক্হশাস্ত্র থেকে আরবণ উঠিয়েছেন। এবং তার মাঝে নিহিত আকর্ষণীয় বিষয়াবলী বের করে নিয়ে এসেছেন।

*   *   *

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বনী উমাইয়া যুগের শেষের কিছু অংশ এবং বনী আব্বাসের প্রথম দিকের কিছু অংশ পেয়েছিলেন।

তিনি, এমন এক সময়ে জীবন কাটিয়েছেন যখন খলীফা এবং তার গভর্ণর উলামায়ে কেরামকে সার্বিক আনুকুল্য ও পৃষ্ঠপোষককতা দিয়েছেন, ফলে চতুর্দিক থেকে তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী আসত অথচ তারা তা টেরও পেতেন না।

কিন্তু হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) ছিলেন অন্যরকম তিনি এসব গ্রহণের পরিবর্তে নিজেকে এবং নিজের ইলমের সম্মান রক্ষা করেছেন...

এবং নিজ হাতের উপার্জন খেতেই তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা...

এবং তিনি এও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তার হাত যেন সর্বদা উপরে থাকে...

*   *   *

একবারের ঘটনা। খলীফা মানসূর সাক্ষাতের জন্য হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কে ডেকে পাঠালেন, তিনি মানসূরের কাছে পৌঁছলে মানসূর তার প্রতি যারপর নাই সম্মান প্রদর্শন করলেন। এবং তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা দিলেন। তাঁকে কাছে বসালেন এবং তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

যখন তিনি চলে আসতে চাইলেন তখন খলীফা ত্রিশ হাজার দিরহাম ভর্তি একটি থলে তার দিকে এগিয়ে দিলেন। অথচ দান না করার ব্যাপারে খলীফার একটা বদনাম ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তখন বললেন ঃ

হে আমীরুল মুমিনীন! আমি তো বাগদাদে একজন পরদেশী মুসাফির

আর এ দীনার-দিরহাম খরচ করার মত কোন জায়গাও আমার নেই। এগুলোর হিফাজতের ব্যাপারে আমার আশংকা হচ্ছে। তাই আমার জন্য এগুলো বাইতুল মালে হিফাজত করে রাখুন। যখন আমার প্রয়োজন পড়বে তখন আমি নিজেই চেয়ে নিব।

খলীফা মানসূর তার কথাই মেনে নিলেন এবং সেগুলো বাইতুল মালেই রেখে দিলেন। কিন্তু হযরত আবু হানীফা (রহ.) এরপর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না।

তার ইন্তেকালের পর দেখা গেল যে তার ঘরে মানুষের রাখা যে আমানত ছিল তা এই ত্রিশ হাজারের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি।

মানসূর এ সংবাদ শুনে বললেন ঃ

আল্লাহ তায়ালা আবু হানীফার প্রতি রহম করুন তিনি আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং আমাদের থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন;

আর এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। কারণ হযরত আবু হানীফা (রহ.) দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন যে নিজ হাতের উপার্জিত খাবারের লোকমার চেয়ে সম্মানিত এবং অধিক পবিত্র কোন লোকমা নেই।

এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করে দেখেছিলেন।

তিনি পশমী সুতা, রেশম ও পশমী কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর ব্যবসা ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপৃত ছিল।

তাঁর ছিল প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

যেখানে প্রচুর পরিমাণে লোকজন আশা-যাওয়া করত, আর মানুষ সেখানে এসে মুআমালা ও লেনদেনে সততা এবং গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে পেত পূর্ণ আমানতদারী ও বিশস্ততা।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষ তাঁর মাঝে উন্নত রুচিবোধের সন্ধান পেয়েছিল।

তাঁর ব্যবসা তাঁর জন্য বয়ে আনত প্রভূত কল্যাণ। এবং আল্লাহর অঢেল অনুগ্রহ তাঁকে প্রদান করত।

তাই তিনি হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে তা যথাস্থানে ব্যয় করতেন।

তাঁর ব্যাপারে একথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, যখনই বছর ঘুরে নতুন বছর আসত তখনই তিনি ব্যবসার লভ্যাংশ হিসাব করতেন, এবং নিজের প্রয়োজনীয় খরচ পরিমাণ অর্থ রেখে দিতেন। তারপর বাকী অর্থ দ্বারা কারী, মুহাদ্দিস, ফুকাহা এবং তালেবে ইলমদের প্রয়োজনীয় সামানাদী, খাবার ও কাপড়-চোপড় কিনে দিতেন।

প্রত্যেকের জন্য একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে রাখতেন এবং তা তাঁদের হাতে দিয়ে বলতেন;

তোমাদের পণ্য সামগ্রীর লভ্যাংশ এগুলো। যা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ আমার হাতে প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্ কসম! আমার নিজস্ব কোন সম্পদ আমি তোমাদেরকে দেইনি।

এতো আমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়।

মানুষের রিযকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ক্ষমতা নেই।

* * *

হযরত আবু হানীফার দানশীলতা বদান্যতার কথা ছড়িয়েছিল তৎকালীন প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে। বিশেষ করে তাঁর সঙ্গীদের সাথে তাঁর ঘটনাবলী ছিল রীতিমত আলোচনার বিষয় এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের সোনালী পাতায়।

একবারের ঘটনা। তার মজলিসে ফিক্‌হ-এর জনৈক সদস্য হযরত আবু হানীফা (রহ.)-এর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এসে বলল; আমার একটি রেশমী কাপড়ের প্রয়োজন।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন; কি রঙের কাপড় আপনি চান?

লোকটি বলল ঃ অমুক রঙের কাপড়।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন; কিছুদিন অপেক্ষা করুন আমার হাতে এই ধরনের কাপড় আসলে আপনার জন্য তা রেখে দিব।

এরপর এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ঐ ধরনের একটি কাপড় হযরত আবু হানীফা (রহ.)-এর হাতে আসল।

তখন হযরত আবু হানীফা (রহ.) সে লোকটির কাছে গিয়ে বললেন ঃ আপনার প্রার্থিত কাপড় আমার হাতে এসেছে এই নিন আপনার কাপড়। লোকটি তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ এর মূল্য কত ?

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ এক দিরহাম।

এবারে লোকটি অত্যন্ত অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল। মাত্র এক দিরহাম ?!!

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ হ্যাঁ

লোকটি এবার বলল ঃ আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করবেন এটাতো কল্পনাও করতে পারিনা।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ না! আমি তো আপনার সাথে ঠাট্টা করছি না।

আমি এই কাপড়ের সাথে অন্য আরেটি কাপড় বিশ দীনার এবং এক দিরহামে কিনেছি।

দুটির মধ্যে একটি কাপড় বিশ দীনারে বিক্রী করেছি আর এই কাপড়টি রয়ে গেছে এর দাম হল এক দিরহাম।

তাছাড়া আমি আমার কোন সঙ্গীর কাছ থেকে লাভ করতে চাই না।

এরপর লোকটি এক দিরহামেই মূল্যবান রেশমের কাপড়টি নিয়ে গেল।

* * *

আরেকবারের ঘটনা। একজন বৃদ্ধা মহিলা একটি রেশমী কাপড় কিনতে এলো।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তার প্রার্থিত কাপড় তার সামনে পেশ করলে বৃদ্ধা বলল ঃ আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি একজন বৃদ্ধা...

এর দাম সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই,

আর এটাতো একটা আমানত।

তাই আপনি যে মূল্যে কিনেছেন সে মূল্যেই বিক্রি করুন তবে সামান্য লাভ করবেন কেননা আমি একজন দরিদ্র মানুষ।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তখন বললেন ঃ আমি দুটি কাপড় কিনেছিলাম। একটি কাপড় ক্রয় মূল্য থেকে চার টাকা লাভে বিক্রী করেছি। আপনি ক্রয় মূল্যেই নিয়ে যান। আপনার কাছ থেকে আমি কোন লাভ করতে চাই না।

তখন মহিলাটি ক্রয় মূল্যেই কাপড়টি কিনে নিয়ে গেল।

* * *

আরেকদিনের ঘটনা হযরত আবু হানীফা (রহ.) তার এক সভাসদের গায়ে জীর্ণশীর্ণ পোশাক দেখতে পেলেন। মজলিস থেকে লোকজন চলে গেলে হযরত আবু হানীফা (রহ.) তাকে বললেন ঃ

এই জায়নামায উঠাও এবং তার নীচে যা আছে তা নিয়ে নাও।

লোকটি জায়নামায উঠাল এবং জায়নামাযের নীচে রাখা এক হাজার দীনার দেখতে পেল।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তাকে বললেন ঃ

এগুলো নিয়ে যাও এবং তোমার পোশাক ও বেশ ভূষা সুন্দর কর।

লোকটি বলল ঃ

আমি তো একজন ধনী মানুষ আল্লাহ্ আমাকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। এগুলোর প্রয়োজন আমার নেই।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তাকে বললেন ঃ

আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন সে নিয়ামতের আলামত কোথায়? তোমার গায়ে তো তার কোন আলামত দেখতে পাচ্ছিনে।

তুমি কি জান না যে রাসূল (সাঃ) বলতেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّرٰى اَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দাকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার প্রকাশ করাকে পছন্দ করেন।

অতএব তোমার উচিৎ তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর পরিপাটি করে রাখা যাতে তোমার অবস্থা দেখে তোমার কোন বন্ধু ব্যাথিত না হয়।

*　　*　　*

হযরত আবু হানীফার বদান্যতা ও দানশীলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যখন তিনি তাঁর পরিবারের জন্য কিছু খরচ করতেন তখন সে পরিমাণ অর্থের অন্য কোন জিনিস অভাবীদের দান করতেন।

যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন তার সমমূল্যের কাপড় দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি যে পরিমাণ খাবেন তাঁর চেয়েও দ্বিগুণ খাবার রেখে দিতেন এবং তা ক্ষুধার্থ ও দরিদ্রকে দিয়ে দিতেন।

*　　*　　*

তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজের সাথে এই প্রতিজ্ঞা করে ছিলেন যে, যদি কথা বলার মাঝে আল্লাহ্র নামে শপথ করেন তাহলে এক দেরহাম সদকা করবেন।

এভাবে বেশ কিছু দিন চলার পর তিনি নিজের উপর ওয়াজিব করে নিলেন যে, যদি তিনি কসম খান তাহলে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সদকা করবেন।

*　　*　　*

হাফ্‌স বিন আব্দুর রহমান ছিলেন হযরত আবু হানীফার (রহ.) ব্যবসায়ী পার্টনার। হযরত আবু হানীফা (রহ.) তাকে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে রেশমী কাপড় দিয়ে পাঠাতেন।

একবার হযরত আবু হানীফা (রহ.) তাকে প্রচুর পণ্য সামগ্রী দিয়ে পাঠালেন। এবং তাঁকে একথা বলে দিলেন যে, অমুক অমুক কাপড়ে কিছু দোষ রয়েছে। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন ঃ যখন তুমি ত্রুটিযুক্ত কাপড়গুলো বিক্রী করবে তখন ক্রেতাকে জানিয়ে দিবে যে এর মধ্যে এই এই দোষ আছে।

হাফস সমস্ত কাপড়ই বিক্রি করে দিল কিন্তু কাপড়ে যে দোষ ত্রুটি আছে ক্রেতাকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে ভুলে গেল।

ফলে তাদের কথা স্মরণ করে যাদের কাছে ত্রুটিযুক্ত কাপড়গুলো বিক্রি করেছেন অথচ ত্রুটি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন নাই তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হলেন।

এরপর হযরত আবু হানীফা (রহ.) যখন বিষয়টা জানতে পারলেন, তখন তিনি আর স্থীর থাকতে পারলেন না। বিক্রিত পণ্যের সমুদয় মূল্যই সদকা করে দিলেন।

* * *

এসব কিছুর উপর হযরত আবু হানীফা (রহ.) ছিলেন সদাচারী শান্তনা প্রদানকারী। তার সাথে যারা ওঠাবসা করে তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে।

আর যে তাঁর থেকে দূরে থাকে সেও বঞ্চিত হয় না, হোক না সে তাঁর শত্রু।

তার জনৈক সাথী বর্ণনা করেন ঃ

আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে বলতে শুনেছি তিনি সুফিয়ান সাওরীকে বলতেন ঃ

হে আবু আব্দুল্লাহ! কোন জিনিস হযরত আবু হানীফাকে গীবত থেকে দূরে রেখেছে? আমি কখনও তাকে তার শত্রুর বদনাম করতেও শুনিনি।

সুফিয়ান সাওরী বললেন ঃ

হযরত আবু হানীফা (রহ.) অত্যন্ত বুদ্ধিমান তিনি তার সৎকর্মের উপর এমন কিছু আপতিত করবেন না যা তার সৎকর্মকে নষ্ট করে।

* * *

মানুষের ভালবাসা পাওয়ার জন্য হযরত আবু হানীফা (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী এবং মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থায়ী রাখার ব্যাপারে ছিলেন প্রত্যাশী।

তার মজলিসের ব্যাপারে কথিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যখন রাস্তা চলতে গিয়ে এমনিতেই তার মজলিসে বসে এবং কিছুক্ষন পর সেই লোকটি চলে যাবার ইচ্ছা করত তখন আবু হানীফা (রহ.) তাঁর সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করতেন এবং তার খোঁজ খবর নিতেন। যদি তার কোন প্রয়োজন থাকত তার পুরা করতেন...

আর যদি অসুস্থ হত তাহলে তার সেবার ব্যবস্থা করতেন।

এবং তাঁর উত্তম ব্যবহারে ঐ ব্যক্তি তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। তাঁর সদাচরণ তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রবল বেগে আকর্ষণ করত।

এসব কিছুর পরও হযরত আবু হানীফা (রহ.) ছিলেন দিনের বেলায় রোযাদার...

রাতে আধারে একনিষ্ট ইবাদতগুযার...

কুরআনের পরম বন্ধু...

সকাল সন্ধ্যায় ইস্তেগফারকারী...

ইবাদতের মধ্যে একনিষ্টতা ও নিবিষ্টতা এইরূপ ছিলো যে তিনি একবার একদল লোকের কাছে গেলেন এবং শুনতে পেলেন যে তারা তার দিকেই ইশারা করে বলছে ঃ

এই লোকটি এতো পরিমাণ ইবাদত করে যে, রাতের বেলায় ঘুমায় না।

তাদের এই কথা শুনার সাথে সাথেই তিনি মনে মনে বলে উঠলেন ঃ

আল্লাহর কাছে আমার যে অবস্থা মানুষ আমাকে তার বিপরিত মনে করে।

আল্লাহ্ কসম। আমার করণীয় সকল কাজ আমি করি না তা সম্পর্কে যদি তারা জানতে পারে তাহলে আমার ব্যাপারে তারা আর কোন আলোচনাই করবে না।

আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমি আর রাতের বেলা ঘুমাব না ।

সেদিন থেকে তিনি নিয়মিতভাবে রাত্রি জাগরণ শুরু করে দিলেন।

তাই তো সারা পৃথিবী যখন অন্ধকারের কালো পর্দায় ঢেকে যেত এবং সমগ্র বিশ্ব ঘুমের ঘরে আচ্ছন্ন হয়ে যেত তখন তিনি সুন্দর কাপড় পড়তেন চিরুণী দ্বারা দাড়ী আচড়াতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে সুসজ্জিত হয়ে যেতেন।

তার পর দাড়িয়ে যেতেন জায়নামাযে এবং সমগ্র রাত কাটিয়ে দিতেন আল্লাহ্‌র ইবাদতে।

অথবা কুরআন তিলাওয়াত করে অথবা দুহাত তুলে কায়মনে দুআ করতে করতে কাটিয়ে দিতেন সারা রাত।

অনেক সময় এক রাতেই পুরো কুরআন শরীফ শেষ করেছেন...

কোন কোন সময় এক আয়াত পড়তে পড়তেই কাটিয়ে দিতেন সারারাত...

বর্ণিত আছে যে তিনি সারা রাত দাড়িয়ে দাড়িয়ে নিম্নোক্ত আয়াত বার বার তিলাওয়াত করেছেন।

بَلِ السَّاعَة مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَأَمَرُّ

এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন আর আল্লাহ্‌র ভয়ে অঝোর ধারায় কেঁদেছেন।

কাঁদতে কাঁদতে তার গলার স্বর আটকে যেত।

তার ব্যাপারেই বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ইশার নামাযের উযূ দিয়ে ফজর নামায আদায় করেছেন। এর মধ্যে একরাতও রাত্রি জাগরণ থেকে বিরত থাকেননি।

এবং যে জায়গায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন সেখানে তিনি সাত হাজার বার কুরআন শরীফ খতম করেছেন।

যখন সূরায়ে যালযালাহ্ তিলাওয়াত করতেন তখন তার গায়ের চামড়া সংকুচিত হয়ে যেত...

এবং হৃদয় কেপে ওঠত...

এবং তিনি দাড়িয়ে বলতে থাকতেন

হে ঐ সত্ত্বা! যিনি অনুপরিমাণ সৎকাজের বিনিময় দিবেন...

হে ঐ সত্ত্বা! যিনি বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজেরও শাস্তি দিবেন...

আপনি আপনার বান্দা নোমানকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিন।

এবং যে জিনিষ তাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয় তা থেকে দূরে রাখুন।

এবং তাকে আপনার অবারিত রহমতে শামিল করুন।

হযরত আবু হানীফা আন-নোমান (রহ.)
দ্বিতীয় পর্ব

আল্লাহ তায়ালার হারাম করা বিষয় থেকে নিজেকে
বাঁচানোর ক্ষেত্রে হযরত আবু হানীফা (রহ.) ছিলেন
অত্যন্ত কঠোর, তিনি দীর্ঘ সময় চুপ থাকতেন
এবং সর্বদা চিন্তামগ্ন থাকতেন।

–ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)

হযরত আবু হানীফা আন নোমান (রহ.)

দ্বিতীয় পর্ব

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন একদল ছাত্র ইমাম মালেকের কাছে উপস্থিত ছিলেন। যখন হযরত আবু হানীফা (রহ.) বের হয়ে আসলেন। তখন উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে ইমাম মালিক বললেন বলতে পার ইনি কে ?

তারা বলল ঃ না।

ইমাম মালিক (রহ.) বললেন ঃ ইনি হলেন নোমান ইবনে সাবিত

তিনি এমন এক ব্যক্তি যদি এই কাঠের স্তম্ভকে স্বর্ণ বলে অভিহিত করেন তাহলে দলীল প্রমাণ দিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে পারবেন।

*   *   *

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্পর্কে ইমাম মালিক (রহ.) যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থই। তার প্রখর ধী-শক্তি এবং তীক্ষ্ম মেধার যে বিবরণ ইমাম মালিক (রহ.) দিয়েছেন, তাতে তিনি সামান্যতম অতিরঞ্জন করেননি।

চিন্তা-চেতনা এবং আকীদার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর অবস্থানের চমকপ্রদ ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

সে সবই ইমাম মালিকের বক্তব্যের সমর্থন করে। অর্থাৎ তিনি যদি মাটিকে স্বর্ণ বলেন তাহলে দলীল প্রমাণের সামনে তা মেনে নেয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকবে না।

অতএব যখন তিনি দ্বীনের জন্য লড়বেন তখন কেমন হবে তার দলীল?!

*   *   *

কুফার জনৈক ব্যক্তি গোমরাহ্ হয়ে গিয়েছিল। কিছু মানুষের কাছে সে ছিল বেশ সম্মানিত, এবং তার কথাও ছিল তাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য।

কিন্তু লোকটা বলে বেড়াত যে হযরত উসমান (রাযিঃ) মূলতঃ ইহুদী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি ইহুদিয়্যাতের উপর অটল ছিলেন...

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তার এই আপত্তিকর কথা শুনে তার কাছে গেলেন এবং বললেন;

আমি আপনার কাছে এসেছি আমার এক সঙ্গীর সাথে আপনার অমুক মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে।

লোকটি আনন্দে বলে উঠল মারহাবা...

আপনার মত ব্যক্তির কোন প্রস্তাব বা প্রয়োজন উপেক্ষা বা প্রত্যাক্ষান করা যায় না...।

কিন্তু পাত্র কে?

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন; সে এমন একজন ব্যক্তি আপন গোত্রে যিনি অত্যন্ত সম্মানিত এবং ধনী...।

অত্যন্ত দানশীল এবং মহানুভব...।

আল্লাহর কিতাবের হাফেজ...।

এক রাকাতেই সারারাত কাটিয়ে দেন...

আল্লাহর ভয়ে অধিক ক্রন্দন করেন...।

লোকটি তখন আনন্দাতিশয্যে বলে উঠল বাহ! বাহ!! যথেষ্ট হয়েছে। আর বলতে হবে না।

প্রস্তাবকারীর যে গুণের বিবরণ আপনি দিয়েছেন এগুলোতো তাকে আমীরুল মুমিনীনের মেয়ের উপযুক্ত বানিয়ে দিবে...

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তখন বললেন; তবে তার মধ্যে একটি দোষ আছে সেটা জেনে রাখা দরকার।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, কি সে দোষ?

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন; সে ইহুদী!!!

লোকটি তখন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠল এবং অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল ইহুদী ?

আপনি একজন ইহুদীর সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চান ?

আল্লাহর কসম! একজন ইহুদীর কাছে আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারব না। যদিও সে পূর্বাপর সমস্ত মানুষের উত্তম গুণ অর্জন করুক না কেন।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তখন বললেন; আপনি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে একজন ইহুদীর কাছে আপনার মেয়েকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন না এবং এটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করছেন!

তাহলে আপনি মানুষের কাছে একথা কিভাবে বলে বেড়ান যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই দুইটি মেয়েকে এক ইহুদীর কাছে বিয়ে দিয়েছেন ?

সাথে সাথে লোকটি একেবারে শিউরে ওঠলো এবং বললঃ

আসতাগফিরুল্লাহ! আমি যে জঘন্য কথা বলেছি সে জন্য আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এবং আমি যে মারাত্মক অপবাদ তাঁকে দিয়েছি সে জন্য আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।

* * *

একবারের ঘটনা, যাহ্হাক আসসারী নামে জনৈক খারেজী হযরত আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছে এসে বলল;

হে আবু হানীফা! তুমি তাওবা কর

হযরত আবু হানীফা (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন; কি থেকে আমি তাওবা করব ?

খারেজী বলল ঃ তুমি যে বল মুআবিয়া এবং আলী (রাযি.)-এর মধ্যে ফয়সালাকারী নিযুক্তির বিষয়টা জায়েয।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তাকে বললেন ঃ এ ব্যাপারে তুমি কি আমার সাথে বাহাছ (বিতর্ক) করতে চাও ?

খারেজী বলল ঃ হ্যাঁ বাহাছ (বিতর্ক) করতে চাই।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ আমরা যে বিষয়ে বাহাছ (বিতর্ক) করব এ ব্যাপারে যদি আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয় তাহলে আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে কে?

খারেজী বলল ঃ তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে ফয়সালাকারী নিযুক্ত করতে পার।

তখন হযরত আবু হানীফা (রহ.) খারেজীর সাথে আগত লোকটির প্রতি ইশারা করে বললেন ঃ তুমি আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে।

এরপর খারেজীর দিকে তাঁকিয়ে বললেন ঃ ফয়সালাকারী হিসাবে আমি তোমার সঙ্গীর প্রতি সন্তুষ্ট আছি তুমি কি তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ?

খারেজী অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং বলল ঃ হ্যাঁ আমি রাজি আছি।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) তখন বললেন ঃ ছি... আমার আর তোমার মধ্যে যে মতবিরোধ হবে তার জন্য তুমি ফয়সালাকারী নিযুক্ত করা জায়েজ মনে কর অথচ দুজন সাহাবীর ক্ষেত্রে তা অপছন্দ করছ ? তোমার এ কেমন ঘৃণ্যনীতি ?

হযরত আবু হানীফার (রহ.) এই কথায় খারেজী লোকটি একেবারে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল আর কোন জবাব তার মুখে এলো না।

* * *

আরেকদিনের ঘটনা। ইসলামী বিশ্বে ফিৎনার বীজ বপনকারী গোমরাহ ও বিদআতী ফিরকার নেতা জাহম বিন সফওয়ান হযরত আবু হানীফা (রহ.)-এর কাছে আসল এবং বলল ঃ

আমি আপনার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই...

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ তোমার সাথে কথা বলা লজ্জার ব্যাপার...

এবং তুমি যে মত পোষন কর সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া মানেই জলন্ত আগুনে প্রবেশ করা।

জাহম ইবনে সফওয়ান তখন বলল ঃ কিভাবে আপনি আমার ব্যাপারে এই ফয়সালা দিলেন অথচ ইতিপূর্বে আপনার সাথে আমার সাক্ষাতই হয়নি, আমার কথাও আপনি শুনেননি?

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে তুমি এমন এমন কথা বল যা কোন আহলে কিবলা বলতে পারে না।

জাহম বলল ঃ তাহলে আপনি কি নাজেনেই আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ তোমার ব্যাপারে তো এটা ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এবং আম খাছ তথা সর্ব সাধারণ এটা জেনে গেছে। অতএব তোমার ব্যাপারে যা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে তা আমার জন্য বলা বৈধ আছে বই কি ?

জাহম ইবনে সফওয়ান তখন বলল ঃ

আমি আপনাকে শুধু ঈমান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই!

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ এখন পর্যন্ত ঈমান কি তা জান না?

জাহম বলল ঃ হ্যাঁ জানি! তবে ঈমানের কিছু বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করা কুফুরী।

জাহম বলল ঃ আমার কথা শোনার পূর্বে আমাকে কুফরীর কথা বলে আঘাত করা আপনার জন্য জায়েয নেই।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পার।

জাহম বলল ঃ আমাকে এমন একজন ব্যক্তির কথা বলুন যে কলবের মাধ্যমে এ কথা বুঝতে পেরেছে যে আল্লাহ এক তার কোন শরীক নেই,

এবং আল্লাহ্র ছিফাতের মধ্যেও তার মত আর কেউ নেই।

এরপর সে মুখে ঘোষণা দেয়ার পূর্বেই মারা গেল তাহলে এমন ব্যক্তি কি মুমিন অবস্থায় মারা যাবে, না কাফের অবস্থায় ?

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ সে কাফের অবস্থায় মারা যাবে এবং সে জাহান্নামী হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে হৃদয় দিয়ে যা চিনতে পেরেছে মুখে তার স্বীকার না করবে। তবে মুখে স্বীকার করতে যদি কোন বাধা থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

জাহম বলল ঃ সে কেন মুমিন হবে না। সে তো যথার্থই আল্লাহকে চিনতে পেরেছে ?

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ কুরআনের প্রতি যদি তোমার ঈমান থাকে এবং কুরআনকেই যদি তুমি দলীল হিসাবে মেনে নাও তাহলে আমি কুরআন দিয়েই তোমার সাথে কথা বলব।

আর যদি কুরআনের প্রতি তোমার ঈমান না থাকে এবং তাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ না কর তাহলে ইসলাম বিরোধীদের সাথে যেভাবে কথা বলি তোমার সাথেও সেভাবে কথা বলব।

জাহম বলল ঃ আমি কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং কুরআনকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করি।

আবু হযরত হানীফা (রহ.) তখন বললেন ঃ দুটি অঙ্গের সমষ্টিতে আল্লাহ ঈমানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন ঃ

একটি হল কলব আর অপরটি হল যবান। কোন একটির দ্বারা নয়।

আর এর সমর্থনে কুরআন হাদীসে অসংখ্য দলীল রয়েছে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَإِذَا سَمِعُوْا مَاأُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاجَاءَنَامِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِيْنَ فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَاقَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ, আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শুনে তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। একারণে যে তারা সত্যকে চিনেছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা মুসলমান হয়ে

গেলাম। অতএব আমাদেরকেও মান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে নাও। আমাদের কী ওযর থাকতে পারে যে আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না? এবং এ আশা করব না যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে এ উক্তির প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দিবেন যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। (সূরায়ে মায়েদাহ ঃ ৮৫)

অতএব এ আয়াতের আলোকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারা সত্যকে চিনেছে অন্তরের মাধ্যমে এবং মুখে তা স্বীকারও করেছেন।

তাই তাদের এই কথার বিনিময় স্বরূপ আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন ঃ

وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَااُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَااُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ

অর্থাৎ ,তোমরা বল! আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, এবং তার বংশধরদের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি। (সূরায়ে বাকারা-১৩৬)

এই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহ্ তায়ালা মুখে উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন শুধু কলবের উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এরশাদ করেন

قُوْلُوْا لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ

তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল সফলকাম হবে...

হাদীসের মধ্যে ও সফলতার মাপকাঠি শুধু কলব দ্বারা আল্লাহ্‌কে চিনার উপর করা হয়নি। বরং তার সাথে কওল তথা মুখে উচ্চারণ করাকেও শামিল করা হয়েছে।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِمَنْ قَالَ لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে...

হাদীসে শুধু এতটুকু বলা হয়নি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে চিনতে পারল সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

যদি কলব দ্বারা চিনতে পারাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট হত এর সাথে মুখে উচ্চারণের কোন প্রয়োজন না হত, তাহলে ইবলীসও মুমিন হত।

কেননা সে তার পালনকর্তাকে ভালভাবেই চিনে। সে জানে যে আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মৃত্যু দান করেন। তিনি পুনরায় জীবিত করবেন এবং তিনি তাকে গোমরাহ্ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে শয়তানের ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

অর্থাৎ, আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে শয়তান বলেছে ঃ

رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সুযোগ দিন।

শয়তান আরও বলেছে ঃ

فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ

"আপনি যেহেতু আমাকে গোমরাহ করেছেন সেহেতু আমি অবশ্যই তাদেরকে আপনার সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব।

অতএব তোমার দাবীই যদি ঠিক হত তাহলে তো অনেক কাফেরও মুমিন হয়ে যেত, কেননা তারা মুখে স্বীকার না করলেও অন্তরে অন্তরে আল্লাহ্র পরিচয় ভালভাবেই জানে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَجَحَدُوْابِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ

তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করল। যদিও এগুলো সত্য বলে অন্তরে তারা বিশ্বাস করেছিল।

এই আয়াতের মধ্যে অন্তরের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে মুমিন বলা হয়নি। মুখে অস্বীকার করার কারণেই তাদেরকে কাফেরের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

এভাবেই হযরত আবু হানীফা (রহ.) অনর্গল দলীল পেশ করে চললেন। কখনও কুরআন দ্বারা কখনও হাদীস দ্বারা আর জাহমের চেহারায় লজ্জা ও লাঞ্ছনার ছাপ স্পষ্ট হচ্ছিল।

সে হযরত আবু হানীফার (রহ.) সামনে থেকে একথা বলতে বলতে উঠে গেল যে, "আপনি আমাকে এমন কিছু বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আবার আমি আপনার কাছে আসব।" এরপর সে চলে গেল।

* * *

একবার হযরত আবু হানীফা (রহ.) একদল মুলহিদের (নাস্তিক) সাথে সাক্ষাৎ করলেন। যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। হযরত আবু হানীফা (রহ.) তাদেরকে বললেন ঃ

ভারি পণ্য এবং বিভিন্ন জিনিস দ্বারা বোঝাই একটি জাহাজ গভীর সমুদ্রে প্রবল ঢেউয়ের মুখে পড়েছে আর প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও জাহাজটি তার নির্দিষ্ট পথে ধীরস্থীর ভাবে চলতে লাগল এবং তার লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাচ্ছিল অথচ তা সামান্যতম প্রকম্পিত হচ্ছিল না আর তার মাঝে কোন নাবিক ও নেই"

এটা কি কল্পনা করা যায় ?

তারা বলল ঃ না এটাতো কোন আকল-বুদ্ধি গ্রহণ করবে না এমনকি তা কল্পনা করাও অসম্ভব।

হযরত আবু হানীফা (রহ.) বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্!

সমুদ্রে নাবিক ছাড়া ধীরস্থীর ভাবে একটি জাহাজ চলাকে তোমরা অসম্ভব মনে করছ?...

অথচ এই বিশ্ব চরাচর কোন সৃষ্টিকর্তা এবং কোন তদবীরকারী ব্যতিত টিকে থাকাকে মেনে নিচ্ছ। অথচ তাতে রয়েছে চলন্ত সৌর জগত এবং বিশাল বিশাল সাগর।

ধ্বংস তোমাদের এবং তোমাদের ধারণাপ্রসূত উদ্ভাবিত বিষয়ের।

*　*　*

পরিশেষে আমরা বলব ঃ

আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু হানীফা (রহ.) কে শক্তিশালী দলীল প্রদানের যোগ্যতা দান করেছেন তার মাধ্যমে তিনি দ্বীনকে হিফাজত করেছেন।

এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাকে যে অনন্য বিতর্ক শক্তি দান করছেন তার দ্বারা শরীয়তের পক্ষে বিতর্ক করেছেন।

তার ইন্তেকালের পর তার অসীয়তনামায় দেখা গেল যে তিনি লিখেছেনঃ

'আমাকে তোমরা পবিত্র ভূমিতে দাফন করবে। যে ভূমি জোর পূর্বক নেয়া হয়েছে বলে সামান্যতম সন্দেহ হয় সেখান থেকে আমাকে দূরে রাখবে।

খলীফা মানসূর যখন তার অসীয়ত সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

مَنْ يَعْذُرُنَا مِنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ حَيًّا وَمَيِّتًا

অর্থাৎ, কে আমাদেরকে আবু হানীফার ক্রোধ এবং তিরস্কার থেকে রক্ষা করবে তাঁর জীবিত বা মৃত্যু অবস্থায়।

*　*　*

হযরত আবু হানীফা (রহ.) আরও অসীয়ত করেছিলেন যে, হাসান ইবনে আম্মারা যেন তাকে গোসল করায়। হাসান যখন তাকে গোসল করাচ্ছিলেন তখন তিনি বলছিলেন ঃ

হে আবু হানীফা! আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন এবং আপনি যে সৎকাজ পূর্বে প্রেরণ করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

কেননা আপনি ত্রিশ বৎসর যাবত ইফতার করেননি। (অর্থাৎ রোযা রেখেছেন)

চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত রাতে ঘুমাননি...

আপনি আপনার পরে সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামকে ক্লান্ত করে দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন কাহিনী

আলোর মিছিল

(ষষ্ঠ খণ্ড)

মূল : ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)
অনুবাদ : মাওলানা ইবরাহীম মোমেন শাহী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
রমযান ১৪২৭ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-41-5

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

Alore Michchil Vol-6
By: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha
Translated by: Mawlana Ibrahim Munin Shahi
Price Tk. 60.00 U.S. $ 3.00 Only

'আলোর মিছিল'-তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

হ্যাঁ, আলোর মিছিল'ই বটে,
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াততো পুরোপুরিই আলো, আবার তাঁর ঈমানী শিক্ষা যার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি আর তাঁদের মাধ্যমে তাবেঈগণ জীবন আলোকিত করেছিলেন, সেটাও ছিলো এক সমুজ্জল আলো। সুতরাং আঁধার এই পৃথিবীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন যথার্থই সমুজ্জল আলোর মিছিল।

আলোর মিছিল গ্রন্থখানি তাবেঈদের জীবন-চরিতমূলক একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে হিদায়াতের আলো। এতে রয়েছে বিখ্যাত তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত চমৎকার জীবন কাহিনীর দ্যুতিময় উপস্থাপনা। আলোর মিছিল তার পাঠককে শোনায় তাঁদের তাকওয়া-পরহেযগারী, সংযম-সাধনা ও নিষ্ঠার শ্লোগান। প্রতিটি জীবনই বিবৃত করে তাঁদের মৃত্যুর স্মরণ, মানবকল্যাণ ও অপূর্ব আত্মত্যাগপূর্ণ পবিত্র জীবনের জয়গান। আলোর মিছিলের প্রতিটি কাহিনীই পাঠক হৃদয়ে রেখে যায় জীবন গঠন ও আত্ম উন্নয়নের এক দীপ্ত আহ্বান।

মহান ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী পড়তে যারা ভালবাসেন, আলোর মিছিল তাদের সেই ভালবাসাকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেবে আরো বহুগুণ। এমনকি যারা জীবন কাহিনী পড়তে অপছন্দ করেন 'আলোর মিছিল' তাদেরও অপছন্দ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সবশেষে বলি- দ্বীন ইসলামও একটি আলো যারা সে আলোকে পছন্দ করেন কিংবা যারা মুসলমান হয়েও ক্ষণিকের মোহে সে আলো থেকে সরে আছেন দূরে-অন্ধকারে, সকলের কাছেই আমন্ত্রণ রইলো আসুন শামিল হই 'আলোর মিছিলে'।

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫